প্রথম অধ্যায়

নিম্নবর্গ : ইতিহাস ও তত্ত্বের সন্ধানে

১. সূচনা

১.১ পরিভাষার খোঁজে

১.২ আন্তনিও গ্রামশির ভাবনায় ‘সাবঅলটার্ন’ প্রসঙ্গ, ‘হেজেমনি’ ধারণা ও ‘সিভিল সোসাইটি’

১.৩ আন্তনিও গ্রামশি ও মিশেল ফুকো : ক্ষমতার ধারণায় দুই চিন্তক

১.৪ ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ : ইতিহাস ও তত্ত্বের সন্ধানে

১.৫ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় নিম্নবর্গীয় চেতনা

১.৬ নিম্নবর্গ : সংজ্ঞা ও স্বরূপ সন্ধান

১.৭ সারাংশ

১. সূচনা

‘নিম্নবর্গ’ শব্দটি উচ্চারণ করলে আমাদের মনে যে ধারণাটি সর্বপ্রথমে জাগরিত হয় তা হল, সমাজে যারা দরিদ্র ও নিচুজাতের মানুষ তাদের কথা। কিন্তু তা আংশিক সত্য। ‘নিম্নবর্গ’ ধারণাটি আসলে আরো বৃহৎ পরিসরে বিস্তৃত। নিম্নবর্গের সমালোচকরা মার্ক্সবাদী ধারণাকে ভিত্তি করে আধিপত্য ও ক্ষমতার এককে নিম্নবর্গকে নির্ধারণ করেছেন। ফলে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা নিম্নবর্গের পরিভাষা, তাত্ত্বিক ধারণা ও নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হব।

১.১ পরিভাষার খোঁজে

‘নিম্নবর্গ’—শব্দটি ইংরেজি ‘সাবঅলটার্ন’ (Subaltern) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। ‘সাবঅলটার্ন’ শব্দটি প্রথম পাওয়া গিয়েছিল ইতালির দার্শনিক ও প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী নেতা আন্তনিও গ্রামশির ‘দ্য প্রিজন নোটবুক’ (The Prison Notebook, 1971) গ্রন্থে। গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল ১৯২৯-১৯৩৫ সালের মধ্যে যখন মুসোলিনির কারাগারে তিনি বন্দি। সেই সময় ফ্যাসিবাদী দৃষ্টি এড়ানোর জন্য গ্রামশি এমন কিছু পরিভাষা গ্রহণ করেছিলেন যাতে মুসোলিনি- কর্তৃপক্ষের কড়া নজর তাঁর ওপর না পড়ে। এটি করতে গিয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থে মার্ক্সের দর্শনকে সাংকেতিকভাবে ‘প্রাক্সিসের দর্শন’ (the philosophy of praxis) বলেছেন। মার্ক্সের নাম কোথাও উচ্চারণ করেননি, তিনি বলেছেন প্রাক্সিসের দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা- ‘Marx reffered to as the founder of philosophy of praxis’ (Hoare (eds.) 1971, p. 8)। ফলে প্রচলিত শব্দগুলির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে লেখার কারণে মার্ক্সীয় ধারণার অনেকটা বদল ঘটেছে। এটা এমনই একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে সাংকেতিক শব্দগুলির পরিবর্তে প্রচলিত শব্দগুলি ব্যবহার করে যদি আমরা একে পড়তে ও বুঝতে চাই তাহলে তার কোনো অর্থই আমরা খুঁজে পাব না। আমাদের আলোচনা যেহেতু নিম্নবর্গ নিয়ে সেহেতু ‘সাবঅলটার্ন’ বলতে গ্রামশি আসলে কী বুঝিয়েছেন, কোনো ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সাবঅলটার্ন প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন, তাঁর হেজেমনি ধারণাটির সঙ্গে ‘সাবঅলটার্ন’ ধারণার কী সম্পর্ক তা ধাপে ধাপে আলোচনায় প্রবেশ করব। তার আগে দেখে নেব ‘সাবঅলটার্ন’ শব্দটির বিভিন্ন আভিধানিক অর্থ।

আভিধানিক অর্থে ‘সাবঅলটার্ন’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে। ক্যাপ্টেনের অধস্তন কর্মচারী বা অফিসারদের ‘সাবঅলটার্ন’ বলা হয়। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ‘অধস্তন’ বা ‘নিম্নস্থিত’। এ প্রসঙ্গে ‘সাবঅলটার্ন’-এর বিভিন্ন আভিধানিক অর্থগুলিকে দেখে নেওয়া যাক।

- The new samsad English to Bengali dictionary. 2001. West Bengal. page 444

ক) শ্রেণি, জাতপাত, বয়স, লিঙ্গ, পদ বা অবস্থান বা অন্য যে কোনো পরিচয়ে প্রাধান্য ভোগী কোনো বর্গের অধীনস্ত নিম্নবর্গ।

খ) সমাজ-বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ ধারা বা ঘরানার অন্তর্গত, এই ধারার সমাজ বিজ্ঞানীগণ নিম্নবর্গীয় জনসাধারণের অভিজ্ঞতা তথা বোধ বা অনুভবের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস আলোচনায় নিয়োজিত।

- Sally Wehmeier, Collin melntosh, Joanna turnbull (eds.). 2000. Oxford advanced learner’s dictionary of current English.OUP. NY. Page- 1528

Subaltern (n) : any officer in the british army who is lower in rank .

- Pearsall, Judy (eds.), 1999. 10th edition. The concise oxford English dictionary. Oxford university press: ny. Page- 1426

Subaltern: n. an officer in the British army below the rank of captain especially is second lieutenant. Adj. of lower status.

- Thompson, Della (eds.). 1996, 8th rev. edition.The pocket oxford dictionary of current English.. OUP. NY page 619.

Subaltern : n. officer below the rank of capation, esp. a second lieutenant.

- G & C. Merriam (eds.).1913.Webster’s revised unabridged dictionary. Oup. Ny. Page- 998

Subaltern : ranked or ranged below, subordinate, inferior : specially (M.L), ranking as a junior officer, being below the rank of captain, as a subaltern officer.

ii) a person holding a subordinate position : specifically a commissioned military officer below the rank of captain.

iii) lower in rank, subordinate : a subaltern employee.

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রত্যেকটি আভিধানিক অর্থে ‘সাবঅলটার্ন’ বলতে বোঝানো হচ্ছে নিম্নস্থিত কর্মচারী বা কারও অধীনস্ত কর্মচারী। এই নিম্নস্থিত বা অধীনতার সূত্র ধরেই গ্রামশি তাঁর ‘হেজেমনি’ ধারণাটি বিস্তারের মধ্য দিয়ে ‘সাবঅলটার্ন’ এবং তার সমার্থক ‘সাবর্ডিনেট’ প্রসঙ্গটির উত্থাপন করেছেন। এই অবকাশে আমরা গ্রামশির ‘হেজেমনি’ ধারণাটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারি।

১.২ আন্তনিও গ্রামশির ভাবনায় 'সাবঅলটার্ন' প্রসঙ্গ, 'হেজেমনি' ধারণা ও 'সিভিল সোসাইটি'

আলোচ্য 'সাবঅলটার্ন' শব্দটি গ্রামশি তাঁর 'দ্য প্রিজন নোটবুক'-গ্রন্থে ঠিক কী অর্থে ব্যবহার করেছেন তা আমাদের দেখে নেওয়া প্রয়োজন। তার আগে গ্রামশি সম্পর্কে দু-চার কথা বলে নেওয়া ভালো। আন্তনিও গ্রামশি ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, সম্পাদক, দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, ইতিহাসকার এবং সাহিত্য সমালোচক। মার্ক্সবাদের সৃজনশীল বিকাশ, প্রচার ও ব্যাপ্তিতে তাঁর অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে। আন্তনিও গ্রামশির জন্ম ১৮৯১ সালে সারদিনিয়া-র অ্যালেস শহরে। ১৮৯৮ সালে ঘিলারজা শহরে স্কুল জীবন শুরু করলেও তাঁর পড়াশোনায় কয়েক বছর বাধা পড়ে। উপার্জনের আশায় তিনি কর্মসংস্থানে বের হন। ১৯১১ সালে টিউরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ পেয়ে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯১৩-১৯১৫ সময়কালে তিনি গুরুতর অসুস্থতায় ভুগতে থাকেন এবং সিদ্ধান্ত নেন শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অব্যাহতি নেওয়ার।

> 'It was during his years at Turin University that gramsci first came into serious contact with the intellectual world of his time. ...Here he was introduced to the particular brand of Hegelianised "philosophy of praxis" to which he remained in an ambiguous critical relationship right to the end of his working life.' (Hoare (eds.) 1971, p. xxii)

গ্রামশির ক্ষুদ্র জীবনকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব, ফ্যাসিবাদের বিকাশ এবং শোষিত, অনুন্নত মানুষের মুক্তির দায়বোধে তাঁর চিন্তার পরিসর বৃদ্ধি পায়। নিজস্ব অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন থেকে এক চিন্তার মহীরুহ তৈরি হয়ে যায় গ্রামশির মধ্যে। দীর্ঘমেয়াদি কারাবাসে তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনাগুলি লিপিবদ্ধ করাকালীন ইতালীয় সমাজ-প্রেক্ষাপটে 'হেজেমনি' (Hoare (eds.) 1971, p.245) 'হেজেমনি' ধারণাটি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন যা শ্রেণি ও সামাজিক শক্তি সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাবায়। 'দ্য প্রিজন নোটবুক'-এর অনুবাদকদ্বয় কুইন্টিন হোয়ার ও জিওফ্রে নওয়েল স্মিথ ভূমিকাংশে জানান,

> '...we have translated dirigente and direttivo as "directive" in order to preserve what for gramsci is a crucial conceptual distinction, between power based on "domination" and the exercise of "direction" or "hegemony". In this context it is also worth noting that the term "hegemony" in Gramsci itself has two faces. On the one hand it is contrasted with "domination" (and as such bound up with the opposition State/ Civil Socity) and on the other hand 'hegemonic' is sometimes used as an opposite of "corporate" or "economic corporate to designate an historical phase in which a given group moves beyond a position of corporate existence and defence of its economic position and aspires to a position of leadership in the political and social arena. Non-hegemonic groups or classes are also called by Gramsci "subordinate'', "subaltern" or sometimes "instrumental."

(Hoare (eds.) 1971, p. xiii-xiv)

মাত্র ৪৬ বছরের জীবনকালে গ্রামশি 'সবার ওপরে মানুষ সত্য' এই ভাবনার উপর জোর দিয়েই যুদ্ধ করে গিয়েছেন। ১৯৭১ সালে গ্রামশির ইতালীয়তে লেখা বইগুলির ইংরেজি অনুবাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক রূপে অনেকের কৌতূহলের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। গ্রামশি তাঁর 'দ্য প্রিজন নোটবুক'-এ 'সাবঅলটার্ন' শব্দটির সমার্থক হিসাবে 'সাব-অর্ডিনেট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলে সমালোচকেরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। কারণ,

> 'Here again we have preserved Gramsci's original terminology despite the strangeness that some of these words have in English and despite the fact that it is difficult to discern any systematic difference in Gramsci's usage between, for instance , subaltern and subordinate.'

(Hoare (eds.) 1971, p. xiv)

তবে গ্রামশি 'সাবঅলটার্ন' শব্দটি যে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন তা স্পষ্ট। প্রথমত, তিনি সরাসরি 'প্রলেতারিয়েত'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সাবঅলটার্ন' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। কারণ গ্রামশি মনে করেন পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় সাবঅলটার্ন হল শ্রমিক শ্রেণি। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ বিন্যাসে তারা শোষিত ও শাসিত হয় এবং প্রলেতারিয়েত এর বিপ্রতীপে অবস্থান করেন হেজেমনি বা বুর্জোয়া শক্তি। দ্বিতীয়ত, 'সাবঅলটার্ন' শব্দটি কেবল পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গেই নয়, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গেও জড়িত। তাহলে দেখা যাচ্ছে 'সাবঅলটার্ন'-এর অর্থ এখানে শুধু শ্রমিকশ্রেণি নয়, যেকোনো সমাজের ক্ষমতা বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে, যার একদিকে 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণি এবং অন্যদিকে তার অধীনস্ত 'সাবঅলটার্ন' শ্রেণি অবস্থান করে। (Hoare (eds.) 1971, p. 13) অন্যদিকে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক গ্রামশির 'সাবঅলটার্ন' শব্দের প্রয়োগ নিয়ে মত প্রকাশ করেছেন এইভাবে,

> "Gramsci was not attempting to define 'subaltern'. Although he insisted on the fragmentary nature of subaltern history in a well known passage, in his own writings, based on a fascist Italy, the line between subaltern and dominant is more retrievable than in the work of subcontinental Subaltern Studies. Gramsci's project is not specifically gender-sensitive in its detail but can be made so"

(Chaturvedi (ed.) 2000, p.324)

দক্ষিণ-এশিয়ার ঐতিহাসিকেরা যাঁরা গ্রামশির থেকে 'সাবঅলটার্ন' শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সমাজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার প্রবণতা থেকে 'সাবঅলটার্ন' শব্দটিকে পৃথক করে দেখাতে চেয়েছেন। গ্রামশির ধারণাকে অনুসরণ করার ফলে মার্ক্সীয় তত্ত্ব ও পরিভাষাকে গ্রহণ করে মার্ক্সীয় ধারণাকে ঔপনিবেশিক সমাজ প্রেক্ষাপটে গতিশীল করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ। পার্থ

চট্টোপাধ্যায়-এর মতে মার্ক্সবাদী তত্ত্বের বিশ্লেষণের সঙ্গে ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সামঞ্জস্য তৈরি করা উচিত।(Chaturvedi (ed.)2000, p. 324) কিন্তু গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মনে করেন,

> "Since, 'subaltern' in the subcontinental use define those who were cut off from the lines that produced the colonial mindset, s/he did not emerge in the culture value-from. Thus, considerations of cultural problematics in Subaltern Studies are not a substitute for, but a supplement to, Marxist theory." (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 325)

ইতালীয় সমাজ প্রেক্ষাপটে গ্রামশি যে 'সাবঅলটার্ন' শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন তা মূলত সারদিনিয়ার কৃষক ও শ্রমিক সমাজকে কেন্দ্রে রেখে। সেখানে যেমন তিনি তাদের শ্রেণিচেতনার কথা উল্লেখ করেছেন তেমনই সমাজের উপরিকাঠামোয় রাষ্ট্র গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসাবেও চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্য সমালোচক গুইডো লিগুওরি তাঁর 'Conception of Subalternity in Gramsci' – প্রবন্ধে গ্রামশির 'সাবঅলটার্ন' শব্দ প্রয়োগের তিনটি দিক তুলে ধরেছেন।

> "... a careful philological reading of Gramsci's use of the concept subaltern in the Prison Notebook reveals that he used the terms subaltern/ subalterns in different manners. First, he used the term with reference to disaggregated section of the population, politically (and therefore culturally) marginalized, whom he judged to be 'at the margins of history'. ...
>
> Second, Gramsci develops the use of the term 'subaltern' with specipic reference to the advenced industrial proletariat. ...
>
> Third, the concept is used with reference to individual subjects, either in relation to their social setting or their cultural limitations. It is not my intention to affirm that the prevalent usage of concept in recent years -especially in the fields of Subaltern Studies and Cultural Studies in the United States –ows its origins to a considaration of this aspects of the prasentation of the 'subaltern' in Gramsci." (Macnally (ed.) 2015, p.129-30)

আলোচ্য এই তিনটি দিক থেকে গ্রামশি 'সাবঅলটার্ন' শব্দের প্রয়োগ করেছেন নাগরিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। যেখানে তাঁর আধিপত্য বা 'হেজেমনি' ধারণাটির সূত্রপাত হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানত সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজের কথা গ্রামশি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ক্ষমতার বিভেদ—এই ব্যাপারটি ঐতিহাসিক পর্বে সিভিল সোসাইটি ও পলিটিক্যাল সোসাইটির মধ্যে সংঘর্ষ বা বলা ভালো রেষারেষির ফলে গড়ে ওঠে।

> 'The separation of powers together with all the discussion provoked by its realisation and the legal dogmas which its appearence brought into being is a product of the struggle between civil socity and political socity in a specific historical period.' (Hoare (eds.) 1971, p. xiii-xiv)

অর্থাৎ গ্রামশির মতে নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের যৌথ ভূমিকায় রাষ্ট্রের স্বরূপ ধরা পড়ে। রাষ্ট্র গড়ে ওঠে শাসকশ্রেণির ক্ষমতা ও আধিপত্যের ওপর নির্ভর করে, যেখানে 'হেজেমনি' বা আধিপত্য

কায়েম রাখার জন্য নাগরিক সমাজ একটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে কাজ করে। কারণ যে নাগরিক সমাজে শ্রমজীবী মানুষেরা বসবাস করে তাদের জন্য যখন রাজনৈতিক সমাজ কোনো নীতি গ্রহণ করে তার পেছনে অবশ্যই তাদের সমর্থন থাকা উচিত। আসলে সিভিল সোসাইটির সঙ্গে পলিটিক্যাল সোসাইটির সম্পর্কটি আনুগত্যের না হয়ে হওয়া উচিত সম্মতির উপর ভিত্তি করে। দেখা যাচ্ছে ডমিন্যান্ট শ্রেণির অপর প্রান্তে অবস্থিত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গ্রামশি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামশি মনে করেন আধিপত্য বা হেজেমনি এমন একটি ধারণা যেখানে রাষ্ট্রশক্তি সৃজিত রীতিনীতির আওতায় সিভিল সোসাইটির সচেতন বা অচেতন মানুষেরা প্রতিবাদহীনভাবে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আর আধিপত্যবাদের মূল কথাই হল শক্তি প্রয়োগ না করে সম্মতি আদায়ের মধ্য দিয়ে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা।

> '...in which one concept of reality is dominant, informing with it's spirit all modes and thought and behaviour. It follows that hegemony is the predominance obtained by consent rather than force of one class or group over other classes. And whereas 'domination' is realized, essentially through the coercive machinary of the state. 'Intellectual' and 'moral leadership' is objectified in, and mainly exercised through, 'civil socity'. the ensemble of educational, religious and associational institutions.' (Jesph 1981, p.24)

এই সম্মতি আদায়ের প্রধান উপাদান হল নাগরিক সমাজ বা সিভিল সোসাইটি যেখানে ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও পেশাভিত্তিক সংগঠনের অবস্থান। এই সব সংগঠনের সম্মতি আদায়ের মধ্য দিয়ে 'হেজেমনি' বা আধিপত্য স্থাপিত হয়। এইভাবে রাষ্ট্রীয়শক্তি সমাজের সর্বস্তরে আধিপত্য কায়েম করেছে এবং শাসকশ্রেণি হিসাবে নিজেদের জায়গা ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এই অবস্থান থেকেই গ্রামশির হেজেমনি বা আধিপত্যের ধারণাটির উদ্ভব হয়েছে। 'হেজেমনি' বলতে শাসকশ্রেণির বিশ্বাস, নৈতিকতা ও বৌদ্ধিক নেতৃত্বের একটি জাল তৈরির ক্ষমতাকে বোঝায় যা সমাজের সকল অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

> 'Hegemony is attained through the myriad ways in which the institutions of civil society operate to shape, directly or indirectly, the cognitive and effective structures whereby men perceive and evaluate problematic social reality.' (Jesph 1981, p.24)

অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী সংগঠন তাদের আধিপত্যকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নাগরিক সমাজকে আকার দিতে ব্যবহার করে। আধিপত্যের প্রভাব সমস্যাযুক্ত সামজিক বাস্তবতার মূল্যায়ন করে সামাজিক সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে সমাজ-কাঠামোয় 'হেজেমনি' ধারণাটিকে রূপ দেয়। লক্ষণীয়, মার্ক্সবাদের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দিক থেকে গ্রামশির 'হেজেমনি' ধারণাটির দ্বিবিধ সংজ্ঞার্থ উঠে আসে। পাশ্চাত্য সমালোচক ওয়াল্টার এল. অ্যাডামসন 'হেজেমনি' ধারণার এই দ্বিবিধ দিক নির্দেশ করেছেন,

> ‘First, it means the consensual basis of an existing political system within civil society. Here it is understood in contrast to the concept of “domination...”
>
> In its second sense, hegemony is an overcoming of the “ economic-corporative”. Here the reference is to a perticular historical stage within the political moment. The hegemonic level represents the advance to a “class- consciousness,...” (Adamson 1980, p. 170-171)

অর্থাৎ রাষ্ট্রের একচেটিয়া সহিংস এবং চূড়ান্ত সালিশির ফলস্বরূপ হেজেমনি ধারণাটির গুরুত্ব হল সর্বহারা শ্রেণির বিকাশের প্রয়োজনের দিকে ইঙ্গিত করার একটি রাজনৈতিক কৌশল যা বর্তমান ক্ষমতাসীন শ্রেণির সম্মতিকে হ্রাস করে। তাহলে একদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি নাগরিক সমাজের ওপর প্রয়োগ করে আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে সামাজিক ক্রুটিকে লাঘব ও প্রতিবাদকে স্তিমিত করে দেওয়ার প্রবণতা যেমন রয়েছে তেমনই অন্যদিকে সমাজের ‘প্রলেতারিয়েত’ শ্রেণির রাজনৈতিক কৌশল রপ্ত করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী সংগঠনের বাধা কাটিয়ে ওঠার পথ হল ‘হেজেমনি’ বা আধিপত্য। আধিপত্যের স্তরে শ্রেণি-সচেতনতাকে আগে থেকেই প্রদর্শিত করা হয় যেখানে শ্রমজীবী মানুষদের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকেই বোঝানো হয় না, বৌদ্ধিক এবং নৈতিক সচেতনতার দিক থেকেও বোঝানো হয় যা আধিপত্যবাদের সাধারণ ধর্ম। সুতরাং ‘হেজেমনি’র সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়,

> “Hegemony, initially a term reffering to the dominance of one state within a confederation, is now generally understood to mean domination by consent. … Fundamentally, hegemony is the power of the ruling class to convince other classes that their interests are the interests of all. Domination is thus exerted not by force, nor even necessarily by active persuasion, but by a more subtle and inclusive power over the economy, and over state apparatuses such as education and the media, by which the ruling class’s interest is presented as the common interest and thus comes to be taken for granted.
>
> The term is useful for describing the success of imperial power over a colonized people who may far outnumber any occupying military force but whose desire for self-determination has been suppressed by a hegemonic notion of the greater good, often couched in terms of social order, stability and advancement, all of which are defined by the colonizing power.”
>
> (Ashcroft (ed.) 1998, p.116)

সমাজে শাসন বজায় রাখতে গেলে ‘হেজেমনি’ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে, কারণ আধিপত্য বিষয়টি ঔপনিবেশিক চিন্তাভাবনা ও ক্ষমতার প্রভাবে ঔপনিবেশিক অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী একটি ধারণা। আসলে আধিপত্য বিষয়টি গ্রামশি আলোচনা করেছেন রাষ্ট্র-গঠনের কার্যকারিতা সম্পর্কে যেখানে রাষ্ট্রের ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতি একটি কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এ পর্যন্ত আলোচনায় দেখা গেল গ্রামশি কথিত ‘হেজেমনি’ ধারণাটি বেশ জটিল, কারণ সিভিল সোসাইটিতে কেবল উৎপাদন পদ্ধতি বা তার উপকরণ নয়, সেখানে বসবাসকারী মানুষের কাছ থেকে

বৌদ্ধিক, নৈতিক ও দার্শনিক সমর্থন আদায় করার পদ্ধতির ভূমিকাও যথেষ্ট। সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে ‘হেজেমনি’ বা আধিপত্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পাচ্ছি তা হল,

- হেজেমনি বা আধিপত্য বলপ্রয়োগ ও দমন পীড়নের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে না, তা সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সর্বব্যাপী সম্পর্ক তৈরি করে তাদের আনুগত্য বা সম্মতি আদায় করে।
- পুঁজিবাদী সমাজ-কাঠামোয় রাজনৈতিক সমাজের পুষ্টতার পাশাপাশি পুরসমাজেরও উন্নতি ঘটে, ফলে সেই নাগরিক সমাজের কাছে পুঁজিবাদীরা হয়ে ওঠে প্রশাসনিক কর্মকর্তা অর্থাৎ তারা পুঁজিবাদীদের অজান্তেই পুঁজিবাদকে সম্মতি জানায় এবং পুঁজিবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।
- গ্রামশি মনে করেন শ্রমিকশ্রেণির কর্তব্য হল নিজস্ব রাজনৈতিক কৌশলকে উন্নত করা যা আধিপত্যের ক্ষেত্রে নিজেদের সচেতন সম্মতি প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করবে এবং ধনতন্ত্রের প্রভাবকে সংকুচিত করে তাদের নিয়ন্ত্রণ শক্তি থেকে শ্রমজীবীদের মুক্তি ঘটবে।
- সমাজবিন্যাসের দিক থেকে প্রভুত্ব বা অধীনতা সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত উৎপাদনের সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় দুটি পরস্পর বিরোধী চেতনার বৈপরীত্যে।
- সর্বোপরি হেজেমনির ফলে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে একধরনের শ্রেণিচেতনা তৈরি হয় যেখানে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের জন্য শ্রমিকশ্রেণি নিজেই রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির সম্পর্ক পীড়ন বা নির্যাতনের উপর নয় বরং তা হওয়া উচিত পরস্পরের মতাদর্শকে মান্যতা দিয়ে গড়ে তোলার। ‘হেজেমনি’ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক নন্দদুলাল সমাদ্দার ‘বহির্বাংলার বাঙালি কি অপর?’ প্রবন্ধে লিখছেন,

> ‘... কেন্দ্রের মস্তিষ্কে প্রান্তবর্তীর ইমেজটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রান্তবাসীর উপর অপরত্ব আরোপ করে কেন্দ্র। এই আরোপকরণের উৎস হেগেমনি। গ্রিক অভিধায় হিগেমোনিয়ার অর্থ হল দাপট। গ্রিক ভাষায় অভিধাটির উৎপত্তি হয়েছিল- যেসময়ে প্রাচীন গ্রিসের সবক’টা নগরী-রাষ্ট্র সমান ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও আথেন্স নগরীর ছিল চূড়ান্ত হিগেমোনিয়া। পরবর্তীকালে প্রুসিয়ার হিগেমোনিয়া ছিল জার্মানিতে। একই গোষ্ঠীতে সবাই সমান হওয়া সত্ত্বেও যে দাপট ফলায় তারই হেগেমনি বা বোলবোলা।’ (প্রধান (সম্পা.) ২০০৩, পৃ. ৫৫)

সুতরাং বলা যেতেই পারে ‘হেজেমনি’ হল ক্ষমতার এমন এক অবস্থানিক সূচক যার মাধ্যমে সমাজ কাঠামোয় উচ্চবর্গীয় ক্ষমতার দাপটে নিম্নবর্গকে চিহ্নিত করা হয়। তাহলে এ প্রসঙ্গে ক্ষমতার আস্ফালনের ধারণাকেও আমাদের বুঝে নিতে হবে। আমরা জানি, ক্ষমতাতত্ত্ব সম্পর্কে ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর

মতামত ও গবেষণা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিতে ক্ষমতার স্বরূপ ও গ্রামশির ক্ষমতার ধারণাকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করলে ক্ষমতা সম্পর্কিত ধারণাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

১.৩ আন্তনিও গ্রামশি ও মিশেল ফুকো : ক্ষমতার ধারণায় দুই চিন্তক

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করলাম গ্রামশির ক্ষমতার ধারণার মূলে রয়েছে আধিপত্যবাদ। কিন্তু মিশেল ফুকো ক্ষমতা ও জ্ঞানতত্ত্বকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা আমাদের আলোচনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালে তাঁর 'ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ' (Foucault 1975, p.1-326) নামক বহু সমালোচিত ও বিতর্কিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা ও জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়। তিনি লক্ষ করেছেন সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কীভাবে সমাজে শাসক দ্বারা আইন তৈরি হয় এবং নিজেদের স্বার্থে তা এমনভাবে শোষিতের জন্য লাগু হয় যা তাদের ভাবতে বাধ্য করে যে সমাজ তাদের জন্য কিছু 'নিয়ম' তৈরি করেছে এবং তা না মানলে তাদের 'শাস্তি' হবে।

> "In Discipline and Punish what I wanted to show how, from the seventeenth and eighteenth centuries onwords, there was a varitable technological take-off in the produtivity of power.... but above all there was established at this period what one might call a new economy of power, that is to say procedures which allowed the effects of power to circulate in a manner at once continuous, uninterrupted, adapted and 'individualised' throughout the entire social body."
>
> (Gordon (ed.) 1980, p.119)

সমাজের সর্বত্র ক্ষমতা রয়েছে। ক্ষমতা সবসময়, সবজায়গায় বিরাজমান। কেউই ক্ষমতাতত্ত্বের বাইরে নয়। ক্ষমতার কোনো সীমা নেই। এক্ষেত্রে শাসক বা শোষক (ফুকো যাদের 'master' বলেছেন) মনে করে তারা শাসিত বা শোষিতদের (ফুকো যাদের 'slave or workmen' বলেছেন) জন্য যে আইন তৈরি করেছেন (হতে পারে সেটা রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন) তা তাদের ওপর আধিপত্য বজায় রাখবে কিন্তু সেই আইন এমনভাবে প্রণয়ন করা হবে যাতে কোনোভাবেই তা শাস্তি হিসাবে প্রদর্শিত না হয় বরং তা দাসের কাছে যেন 'প্রভুর ভালোবাসা' (Gordon (ed.) 1980, p.139) স্বরূপ প্রকাশ পায়। শাসক-শ্রেণির ক্ষমতা বিস্তারের এই পদ্ধতি সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর বক্তব্য,

> ''its seems to me that power is 'always already there', that one is never 'outside' it, that there are no 'margins' for those who break with the system to gambol in. But this does not entail the necessity of accepting an inescapable from of domination or an absolute privilege on the side of the law. To say that one can never be 'outside' power does not mean that one is trapped and condemned to defeat no matter what." (Faubion (ed.) 1994, p.xiv)

ক্ষমতা প্রয়োগ করার কৌশলে একটি ‘নেটওয়ার্ক’ বা কায়দা-কানুন থাকে যা প্রয়োগের সিদ্ধান্তকে পরবর্তীকালে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তাতে যেন কোনো সন্দেহ না থাকে। কারণ সন্দেহ তৈরি হলেই সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই সমস্যার প্রতিও ফুকো আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,

> “This reduction of power to law has three main roles : (i) It underwrites a schema of power which is homogeneous for every level and domain- family or state, relations of education or production. (ii) It enables power never to be thought of in other than negetive terms : refusal, limitation, obstruction, censorship, Power is what say no. And the challenging of power as thus conceived can appear only as transgression. (iii) It allwos the fundamental operation of power to be thought of as that of a speech-act : enunciation of law, discoures of prohibition .” (Gordon (ed.) 1980, p.139-40)

যার ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা হচ্ছে সে যেন এটাই বিশ্বাস করে যে তার ভালোর জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং শাসকের প্রতি যেন তাদের সম্মতি বজায় থাকে। ইতিপূর্বে গ্রামশির আলোচনায় এই কথাটাই তিনি বলতে চেয়েছেন। শাসকশ্রেণির ক্ষমতা মূলত কিছু আইন প্রণয়নের দ্বারা আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে যার থেকে পালানোর পথ নেই। আসলে সাধারণ মানুষকে কায়দা-কানুনের বেড়ি পড়িয়ে কোনোদিকে, কীসের আশায় টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে- এই উত্তরই ফুকো সারা জীবন ধরে খুঁজেছেন এবং জেনেছেন ক্ষমতা প্রয়োগের কৌশলগুলো প্রকারান্তরে নতুন জ্ঞানের জন্ম দেয়। আর এখান থেকেই শুরু হয় ক্ষমতা ও জ্ঞানের সম্পর্ক। অবস্থা অনুযায়ী আধিপত্যবাদীরা কখনো বুদ্ধি খাটায়, চিন্তা করে, আবার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্মতি আদায়ের জন্য। ক্ষমতা প্রয়োগের কৌশলে জড়িয়ে যাওয়া মানুষগুলির মধ্যে এই চেতনাও প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় যে তারা অধীন এবং শাসিত হওয়াই তাদের শ্রেয়। ফুকো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূলত ক্ষমতার নিষ্ঠুরতা দেখাতে চেয়েছেন। তাই তিনি মনে করেন সমাজ কাঠামোয় ক্ষমতা তিন ধরনের উপাদানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, যেমন- সার্বভৌমত্ব বা প্রভুত্ব, অনুশাসন করার কৌশল ও প্রশাসনিকতা।

> “... we need to see things not in terms of the replacement of a society of sovereignty by a disciplinary society and the subsequent replacement of a disciplinary society by a society of government; in reality one has a triangle, sovereignty-discipline- government, which has as its primary target the population and as its essential mechanism the apparatuses of security.”
>
> (Faubion (ed.) 1994, p. 219)

ফুকো কথিত আলোচ্য এই তিন ধরনের ক্ষমতার ধারণা সম্পর্কে বলা যেতে পারে-

প্রথমত, সার্বভৌমত্ব বা প্রভুত্ব হল রাষ্ট্রক্ষমতা। যে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চল বা সেই অঞ্চলের প্রজামণ্ডলীর উপর। যেখানে ক্ষমতা দেখানো হয় আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে।

দ্বিতীয়ত, অনুশাসন বলতে বোঝান হয়েছে হাসপাতাল, কারাগার, স্কুল, কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষকে নজরবন্দি করে রাখা হয়। এই শাসন শারীরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে না বরং মানুষের চেতনায় আঘাত করে। এখানেই ক্ষমতা সবচেয়ে প্রবলভাবে কার্যকর। নজরবন্দি করে অনুশাসন করা একপ্রকার স্বাধীনতা খর্ব করার নামান্তর। কিন্তু আমরা ভাবি আমাদের মঙ্গলের জন্য অনুশাসনের প্রয়োজন রয়েছে। এভাবেই আমরা প্রত্যেকে কোনো না কোনোভাবে নজরবন্দি। এই হল আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র যার অন্যতম অস্ত্র অনুশাসন।

তৃতীয়ত, প্রশাসনিক ক্ষমতা। ‘গভর্নমেন্ট’ শব্দটি থেকে প্রশাসনিক ক্ষমতাকে পৃথক করার জন্য ফুকো একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন—‘গভর্নমেন্টালিটি’ (Faubion (ed.) 1994, p.218) অর্থাৎ ‘প্রশাসনিকতা বা প্রশাসনিক মানসিকতা’। আধিপত্যবাদীরা ক্ষমতা প্রয়োগ করবে সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য। তবে তা সার্বিক অর্থে কল্যাণ নয়। ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন। এই কৌশলে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রধান অবলম্বন হল জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে প্রশাসনিক জ্ঞান তথ্য সংগ্রহ করা। অর্থাৎ এই প্রশাসনিক মানসিকতার মূলে রয়েছে বুদ্ধিজীবী সংগঠন। (দত্তগুপ্ত ২০১৯, পৃ.২৭৪) প্রশাসনিক মানসিকতা সম্পর্কে মিশেল ফুকোর অভিমত,

> “By this word I mean three things :
>
> 1. The ensemble fromed by the institutions, procedures, analyses, and reflections, the calculations and tactics that allow the exercise of this very specific albeit complex form of power, which has as as its target population, as it principal form of knowledge political economy, and as its essential technical means apparatuses of security.
> 2. The tendency that, over a long period and throughout the west, has steadily led toward preeminence over all other froms (sovereignty, discipline, and so on) of this type of power–which may be termed “government”—resulting, on the one hand, in the formation of a whole series of specific governmental apparatuses, and on the other , in the development of a whole complex of knowledges.
> 3. The process or, rather, the result of the process through which the state of justice of the Middle Ages transfromed into the administrative state during the fifteenth and sixteenth centuries and gradually becomes “governmentalized”. (Faubion (ed.) 1994, p. 219-20)

অর্থাৎ প্রশাসনিক ক্ষমতা হল একধরনের সংস্থা, পদ্ধতি, বিশ্লেষণ বা প্রতিচ্ছবি দ্বারা পরিবেষ্টিত একধরনের কৌশল যা একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অনুশীলনকে মঞ্জুরি দেয় যার মূল লক্ষ্য জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থানের আধারকে প্রয়োজনীয় তথ্য বা সরঞ্জাম হিসাবে প্রযুক্তিগতভাবে সুরক্ষিত রাখা। এই ধরনের ক্ষমতা একদিকে জনগণের সার্বিক গঠন ও বিকাশ এবং অন্যদিকে জ্ঞানের জটিল ধারণাকে একসঙ্গে বহন করে যাকে ‘সরকার’ নামে অভিহিত করা যায়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে সমাজের ন্যায়বিচারের ধারণাগুলির পরবর্তীকালে সমাজে সরকারীকরণ হয়ে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে,

রাষ্ট্রযন্ত্র যার হাতেই থাক না কেন ক্ষমতার জাল বিস্তারের কৌশল একই কাঠামোতে চলতে থাকে। ক্ষমতার হাত থেকে সমাজের মুক্তি নেই। আসলে গ্রামশি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে দলীয় নেতৃত্বের কাছে সারদিনিয়ার কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির সিদ্ধান্ত ও সম্মতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার আবেদন করেছেন। কারণ তাদের মধ্যে শ্রেণি বা সমাজ সচেতনতা তৈরি না হলেও তারা শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম। ফলে আধিপত্য যাতে শোষণ হিসাবে প্রদর্শিত না হয় তার জন্য প্রয়োজন কৃষক ও শ্রমিক সমস্যাকে অবহেলা না করে গুরুত্বের সঙ্গে সমাধান করার চেষ্টা করা। এই চেষ্টার জন্য সমাজসচেতন সংগঠকের উচিত সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেওয়া যা গ্রামশির কাছে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত। এই জন্য তিনি বরাবর শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণিকে নিজেদের রাজনৈতিক চেতনাকে উন্নত করার পরামর্শ দিয়েছেন। (Hoare (eds.) 1971, p.247) মিশেল ফুকোর কাছে এই সমাজচেতনাই হল আধুনিক সমাজে ক্ষমতার উৎস।

লক্ষণীয়, গ্রামশি ও ফুকোর ক্ষমতার ধারণার মধ্যে সূক্ষ্ম বৈসাদৃশ্য থাকলেও উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ধারণার ক্ষেত্রে বিস্তৃত অর্থে ক্ষমতাকেই শেষ কথা বলে ধরা হচ্ছে। ফুকোর বিশ্লেষণ থেকে ক্ষমতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উঠে আসে। আলোচনার সুবিধার্থে এখানে ক্ষমতার স্বরূপ তাঁদের ভাবনায় কীভাবে ধরা দিয়েছে তা সূত্রাকারে দেখান যেতে পারে-

ক) গ্রামশির মতে পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় আধিপত্যবাদীরা শুধু অর্থনৈতিক স্তরেই ক্ষমতার প্রয়োগ করে না অন্যান্য স্তরেও করে। অন্যদিকে ফুকো মনে করেন ক্ষমতা সামাজিক বিন্যাসের সর্বস্তরেই বিদ্যমান এবং তা সামাজিক স্তরে বিভিন্ন কলা কৌশলের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করা হয়। ক্ষমতা স্থির নয়, সে স্তর ও ক্ষেত্র ভেদে বদলে যায়।

খ) গ্রামশির মতে আধিপত্যবাদীরা তাদের ক্ষমতা কেবলমাত্র দমন পীড়নের মাধ্যমে প্রভাব ফেলে না, বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারাও জন-সাধারণের মধ্যে সর্বব্যাপী সম্মতি আদায় করতেও সক্ষম হয়। অন্যদিকে ফুকো ক্ষমতাকে সার্বভৌম মনে করেননি। তাঁর মতে সবচেয়ে প্রবল প্রভাববিস্তারকারী ক্ষমতা হল—অনুশাসন ও প্রশাসনিক মানসিকতা।

গ্রামশি ও ফুকোর ক্ষমতা সম্পর্কিত দুই প্রেক্ষিতে এ কথাই সাধারণভাবে উঠে আসে—ক্ষমতা প্রয়োগ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার মতো, যা পরবর্তীকালে এ সত্য প্রতিষ্ঠা করে যে ক্ষমতা যাদের ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে তাদের চেতনায় সেটি যেন সম্মতিজনক হয়। ক্ষমতা প্রয়োগের সম্মতি যারা দেয় তারাই নিম্নবর্গ এবং যারা সম্মতি আদায় করে তারাই উচ্চবর্গ। ইতিহাসবিদ পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,

> 'গ্রামশির ইঙ্গিতগুলিকে অনুসরণ করেই নিম্নবর্গের ধারণাটির উদ্ভব। কিন্তু তাঁর প্রয়োগ ও বিস্তার করা হয়েছে ভারতবর্ষের সমাজ-ইতিহাসের ক্ষেত্রে।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৫)

সমালোচক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর 'উপনিবেশিক ভারতে ইতিহাসের গতিবিধি' প্রবন্ধের এক জায়গায় সে কথাই বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে সাবঅলটার্ন স্টাডিজের ঐতিহাসিকেরা-

> 'গ্রামশির কাছ থেকে নিম্নবর্গ ও আধিপত্যের ধারণা এবং ফুকোর কাছ থেকে নিয়েছেন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকৃত অবস্থান ও আপেক্ষিকতার প্রত্যয়।' (ইসলাম চৌধুরী (সম্পা.) ২০০৪, পৃ.৩০)

ইতিপূর্বের আলোচনা সংক্ষেপে বলা যায়, মূলত ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে লেখা গ্রামশির চিন্তা-চেতনা থেকে আধিপত্যবাদ বা 'হেজেমনি'র ধারণা এবং ১৯৭৫ সালে মিশেল ফুকোর ক্ষমতা-তত্ত্বের বিকেন্দ্রীকরণের ধারণার মিশ্রিত ভাবনায় ১৯৮২ সালে রণজিৎ গুহ ও তাঁর নেতৃত্বে একদল সমালোচক দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহাসিক ও ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজের' সূত্রপাত করেন। এরই মধ্য দিয়ে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রাথমিক চর্চা শুরু হয়।

১.৪ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' : ইতিহাস ও তত্ত্বের সন্ধানে

আমরা জানি প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানোর কাজটি করতে হয়। বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে রণজিৎ গুহের নেতৃত্বে সাবঅলটার্ন স্টাডিজ-এর প্রথম খণ্ড (১৯৮২) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনাতত্ত্বের বিকাশে একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ শুরু হয় এবং নানা সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' স্বতন্ত্র একটি তত্ত্বে পরিণত হয়। ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে যথাক্রমে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রথম খণ্ড প্রকাশ এবং 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এর সূত্রপাত হলেও এই নতুন তত্ত্ব গঠনের প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে আসছিল সত্তর-এর দশক থেকেই। কীভাবে নিম্নবর্গচর্চার সূত্রপাত হল এবং এর ক্রমবিকাশের ধারাটি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের দেখে নিতে হবে ডেভিড লাডেন-এর 'A brief history of subalternity' প্রবন্ধ।

> "SUBALTERN STUDEIS began its impressive career in England at the end of the 1970s, when conversations subaltern theams among a small group of English and Indian historians led to a proposal to launch a new journal in India. Oxford University Press in New Delhi agreed instead to publish three volumes of essay called ' Subaltern Studeis : writtings on South Asian History and society.' These appeared annually from 1982 and their success simulated three more volumes in the next five years, all edited by Ranajit Guha (ed.). When he retired as editor in 1989, Ranajit Guha (ed.) and eight collaborators had written thirty four of thirty seven essay in six subaltern studies volumes, as well as fifteen related books.'' (Ludden (ed.) 2002, p.1)

১৯৯৩ সালে রণজিৎ গুহের অধীনে আটজন সদস্যের (শাহীদ আমিন, ডেভিড আর্নল্ড, গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডেভিড হার্ডিম্যান, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে এবং সুমিত সরকার) একটি কমিটি নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় ব্যাপক সাড়া লক্ষ করে দিকে আরো একধাপ এগিয়ে যেতে উৎসাহিত হন। ১৯৮২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মোট বারোটি খণ্ডে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে ৪৪ জনের প্রায় ২০০ টিরও বেশি প্রবন্ধ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদসহ জায়গা পেয়েছে। নব্বইয়ের দশকে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং বহুচর্চিত বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫, সাল পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডগুলির ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে পরবর্তীকালে প্রকাশিত খণ্ডের চিন্তাভাবনার তুলনায়। সমালোচকদের বৌদ্ধিক প্রভাবে চিন্তা-চেতনায় এসেছে পরিবর্তন ও রূপান্তর।

গ্রামশির ধারণাকে সম্পৃক্ত করে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর ঐতিহাসিক গবেষণা শুরু হয়েছিল। সত্তরের দশকের শেষের দিকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ও সামজিক ইতিহাসের ভেতর দিয়ে গবেষকেরা 'History from bellow' ধারণাকে পোষণ করে আসছিলেন যার ধারণা ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ই. পি থম্পসন-এর 'The Making of the English working class' (Thompson 1963, p. 9-838) গ্রন্থ থেকে গবেষকেরা পেয়েছিলেন। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজের' প্রথম তিন খণ্ডে এগার জন লেখক (শাহীদ আমিন, ডেভিড আর্নল্ড, গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী, এন. কে চন্দ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ এন দাস, ডেভিড হার্ডিম্যান, স্টিফেন হেমিংহাম, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে এবং সুমিত সরকার) সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে নিবিড়ভাবে আলোচনা করেছেন।

ইতিহাস অর্থাৎ অতীত। এই অতীতকে অক্ষরের মধ্য দিয়ে সাজানোর কাজটি করেছেন মূলত ক্ষমতালিপ্সু বৌদ্ধিক মস্তিষ্ক। তাই সেখানে স্থান পেয়েছে পুঁজিবাদী উচ্চবর্গের কণ্ঠস্বর। ইতিহাসের কথাই যদি বলতে হয় তাহলে ১৮৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের আগেও ইতিহাস লেখা হয়েছে, তারও আগে লেখা হয়েছে রাজকাহিনিভিত্তিক ইতিহাস। ইংরেজ শাসনকালে লেখা হল জাতীয়তাবাদী ইতিহাস। জাতীয়তাবাদ একটি আধুনিক ধারণা। এর মধ্য দিয়ে স্বদেশ তথা মাতৃভূমির মর্যাদা-অমর্যাদা, গৌরব-অগৌরবকে কেন্দ্র করে দেশের মানুষ বা জাতির মমত্ব, উল্লাস, আবেগ-অনুভূতি, জাতীয় চেতনা ও একাত্মবোধ প্রদর্শিত হয়। ইংরেজরা এদেশে আগমনের পর ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়রা ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে এবং নিজেরাও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত হয়। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের সঙ্গেই রচিত হল মার্ক্সীয় ইতিহাস। যেখানে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, পুঁজিবাদ ও শ্রমিকশ্রেণির বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধারণা প্রতিষ্ঠিত হল ইংরেজদের

আগমনে। কিন্তু ভারতবর্ষের বুকে যে ইতিহাসবিদ্যার চর্চা শুরু হল তা সম্পূর্ণই উচ্চবর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ইতিহাস। ইতিহাসের মুখ্য হিসাবে উচ্চবর্গের স্থান ইংরেজদের পরেই। এর মধ্যে সামন্ততন্ত্র, জমিদারী প্রথাও অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে যে ইতিহাসে রাজ-রাজার কাহিনি বা ঠাকুর-দেবতার পৌরাণিক প্রসঙ্গ আলোচিত হত, এখন নতুন নিয়মে ইতিহাসের পাতা দখল করল ইংরেজ ও ইংরেজ শাসিত সমাজে যাদের অর্থের জোর বেশি তাদের মাহাত্ম্য। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভারতের বুকে যেসব কৃষকবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে, কৃষকবিদ্রোহের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে সেখানে কৃষকচৈতন্যের স্থান নেই, কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনার উল্লেখের পরিবর্তে সে স্থানে এসেছে উচ্চবর্গ ও ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পরিচালনার কথা, লেখা হয়েছে কৃষকবিদ্রোহের ব্যর্থতার ইতিহাস। উচ্চবর্গের এই মাহাত্ম্যের বিপক্ষে শুরু হল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। যদিও রণজিৎ গুহ জানিয়েছেন, এই ধরনের জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যাটি হল উচ্চবর্গের রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত হওয়ার অপর নাম। যেখানে আদর্শ-নিষ্ঠা বা জনকল্যাণের স্থান নেই, আছে শুধু অর্থ, যশ ও ক্ষমতার লোভ। সেই লোভের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য ইংরেজ, স্বদেশী উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে অসহযোগিতা ও সংঘাতের কাহিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলকথা। ফলে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ডটি ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্রে রেখে আলোচনা করা হয়েছে এই মর্মে, যে লক্ষ লক্ষ লোক উচ্চবর্গের বিরোধিতা করে আন্দোলন সংগঠিত করল, প্রাণ দিল দেশের কল্যাণার্থে, তাদের চৈতন্য বলে কি কিছুই নেই? তর্কের খাতিরে যদি নিম্নবর্গের চৈতন্যকে একটি আলাদা সত্তা হিসাবে গণ্য করা হয়, তাহলে তার বৈশিষ্ট্য কী? উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক কোনো তত্ত্ব বা বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে বুঝব? এই প্রশ্নগুলিই উঠে এসেছে উচ্চবর্গের জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১৪) ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাস ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সবটাই দেশি বা বিলিতি বুর্জোয়াদের কৃতিত্ব। কিন্তু যারা সত্যি সত্যিই এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিম্নবর্গের ভূমিকা বুঝতে চেষ্টা করেছেন তারাও নিরুপায় হয়ে উচ্চবর্গের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার উপরেই নির্ভর করেছেন। ফলে নিম্নবর্গের চৈতন্যের স্বতন্ত্র প্রকাশ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সুতরাং আলোচনার বাইরে থেকেই একপ্রকার প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র চেতনা বলে কিছু নেই। যা আছে তা উচ্চবর্গের কাছ থেকে পাওয়া।

ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদরা ক্ষমতা ও আধিপত্যবাদকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইতিহাসবিদরা নিম্নবর্গের ইতিহাস নির্মাণে ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক ও কৃষক বিদ্রোহের চরিত্র,

তাদের স্বর ও সংকটকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। উচ্চবর্গ থেকে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক মতাদর্শ, উদ্দেশ্য, পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য এবং নিম্নবর্গের চেতনার নিজস্বতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা অন্বেষণ ও উন্মোচনের অভিপ্রায়ে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ গোষ্ঠীর পথচলা। আর এই পথ ধরেই নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার অগ্রযাত্রা। **১৯৮২–১৯৯৯** সাল পর্যন্ত 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর নানা তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, যা পরবর্তীকালে একাডেমিক ক্ষেত্রে একটি তাত্ত্বিক পরিসর তৈরি করেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা দেখে নেব 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর আলোচ্য বিষয়গুলিকে।

১.৪.১ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' : আলোচ্য বিষয়

'Subaltern Studies'-এর বারোটি খণ্ড, 'Selected Subaltern Studies', 'Reading Subaltern studies', 'Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial', 'Dominance without Hegemony' ইত্যাদি গ্রন্থে সমালোচকেরা যে সব দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নবর্গের ইতিহাসকে দেখতে চেয়েছেন তার মধ্যে বিশেষ করে উঠে এসেছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি।

- 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর সমালোচকরা সিদ্ধান্ত নিলেন এমন এক ইতিহাস রচনার যেখানে উচ্চবর্গীয় চিন্তা-চেতনার বিপরীতে সমাজ-কাঠামোর তলদেশে থাকা নিম্নবর্গ নিজেদের ইতিহাস নিজেরাই তৈরি করছে।
- রণজিৎ গুহ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে এই গ্রন্থের লক্ষ্য চিহ্নিত করে বলেছেন, দক্ষিণ-এশিয় ইতিহাসচর্চায় নিম্নবর্গের বিষয় ও ধারণার পদ্ধতিগত, তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করা এবং গবেষণার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণির পক্ষপাতিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করা।

  > "Indeed, It will be very much a part of our endeavour to make sure that our emphasis on the subaltern functions both as a measure of objective assesment of the role of the elite and as a critique of elitist interpretations of that role." (Guha (ed.) 1982, p. vii)

- নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চার মূল দিকটি হল—সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিরোধিতা করে মার্ক্সবাদের আশ্রয়ে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক সচেতনতা বা বলা ভালো উচ্চবর্গের বিপরীতে অবস্থানকালে নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার স্বাতন্ত্র্য সন্ধানের চেষ্টা করা। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম তিনটি খণ্ডে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে উপনিবেশবাদ ও বুর্জোয়ার আভিজাত্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

> "Subaltern Studies began as an attemt to transfrom the writing of colonial indian history by drawing on the fluid concepts of class and state articulated in the Prison notebook of Antonio Gramsci. The very name of the project, and title of the series , demonstrated a commitment to further developing the political agenda of this Italian revolutionary socialist." (Chaturvedi (ed.)2000, p. viii)

- নিম্নবর্গের সমালোচকরা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকালে জাতীয়তাবোধ ও নবজাগরণের উন্মেষ এবং বিভিন্ন গণআন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠার নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান করেছেন যেখানে কৃষকদের শ্রেণিচেতনাকে তত্ত্বের কাঠামোয় আলোচনা করার প্রয়াস করা হয়েছে।
- গ্রামশি কথিত শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক সচেতনতার কথা মাথায় রেখে নিম্নবর্গের সমালোচকরা ঔপনিবেশিক মহাদেশে কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।
- বিশিষ্ট তাত্ত্বিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের অবস্থান অনুসন্ধান করার মধ্য দিয়ে নারীর অধীনতা এবং নিম্নবর্গ ধারণা হিসাবে নারী কতটা নিম্নবর্গের আওতাভুক্ত তা স্পষ্ট করতে চেয়েছেন।
- সমাজের মুষ্টিমেয় অভিজাত বা উচ্চবর্গের অবস্থান, রাজনীতি ও মতাদর্শের বিপরীতে অবস্থিত একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে নিম্নবর্গের চেতনা ও স্বতন্ত্র্য বিভেদরেখাটি স্পষ্টভাবে তাত্ত্বিক কাঠামোয় আলোচনা করা হয়েছে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায়।
- নিম্নবর্গের ইতিহাসের আরেকটি দিক হল, 'ঐতিহাসিক উত্তরণের সমস্যা।' উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের সম্ভবনা কতটা এবং নিম্নবর্গের চেতনার স্বতন্ত্র রূপটিতে পরিবর্তনের সম্ভবনা আছে কি না, থাকলেও তা কীভাবে ঘটে—এই দিকটি গুরুত্ব লাভ করেছে।
- সাম্প্রতিক পর্বে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ তিনটি সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় উল্লেখযোগ্যভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ প্রথা এবং মহিলাদের সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা।

১.৪.২ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' : উদ্দেশ্য ও গতিমুখ

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' দশটি খণ্ডে প্রকাশিত হওয়ার পর প্রকল্পটি বিশ্বব্যাপী একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অর্জন করে। আলোচ্য প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা ঔপনিবেশিক ভারতের

স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাসমূহ প্রস্তুত করেন এই মর্মে যে, অনভিজাত শ্রেণির রাজনীতিকে অস্বীকার করে অভিজাতশ্রেণির অবদানের কথা ইতিহাসে পরিস্ফুট হয়েছে। 'সাবঅলটার্ন' গোষ্ঠী এই ধারণাটির বিপক্ষে 'তল থেকে ইতিহাস' রচনার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যেখানে নিম্নবর্গ তাদের নিজস্ব ইতিহাস রচনা করবে। তাছাড়াও উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ-এর রাজনৈতিক পদ্ধতির পৃথকীকরণের পাশাপাশি নিম্নবর্গের অধীনতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয় চেতনা অনুসন্ধান করেছেন।

দেখা গেল, প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস রচনার বিরোধিতা করাই 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর মূল শক্তি। যদিও বিরোধিতা করে আধিপত্য-অধীনতা বা শাসক-শাসিত-এর দ্ব্যণুক সম্পর্কের অবসান ঘটানো যাবে না, কিন্তু একজন নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক –

> "... বিরোধী ইতিহাস লিখতে পারেন, যেখানে উচ্চবর্গের আধিপত্য অস্বীকার করে নিম্নবর্গ তার নিজের ঐতিহাসিক উদ্যমের কথা বলতে পারে। নিজের ক্রিয়াকলাপের কর্তা হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করতে পারে। সে ইতিহাস কখনোই পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাসের সামগ্রিকতা অর্জন করতে পারবে না। নিম্নবর্গ কখনোই গোটা সমাজের হয়ে কথা বলতে পারবে না। নিম্নবর্গের ইতিহাস তাই অনিবার্যভাবে আংশিক, অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ।"(ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১৪)

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' একটি বৌদ্ধিক উৎস যার অন্তক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছিল পশ্চিমা মার্কসবাদ এবং ভারতীয় রাজনৈতিক সমাজ-সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, সত্তরের দশকে ব্রিটেনে গ্রামশির চিন্তা-দর্শন যখন গভীরভাবে প্রসারিত হচ্ছিল তখন ই. পি থম্পসন, ক্রিস্টোফার হিল, রডনি হিলটন, হবস্বম প্রমুখ ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা ইউরোপীয় সমাজে গ্রামশির সংস্কৃতি ও আধিপত্যের বিষয়ে মনোনিবেশ করে 'তল থেকে ইতিহাস' দেখার কথা উল্লেখ করেছিলেন যেখানে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও ভূমিকার প্রসঙ্গ সারা বিশ্বে ইতিহাসের অধ্যয়নে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। (Chaturvedi (ed.)2000, p. ix) ইতিহাস অধ্যয়নের এই ধারণা থেকেই নিম্নবর্গের সমালোচকরা ঔপনিবেশিক সমালোচনার অঙ্গ হিসাবে দক্ষিণ-এশিয়ার সমাজ প্রেক্ষাপটে 'তল থেকে ইতিহাস' লেখাকে সংশোধন করার প্রয়াস করেছেন এবং অভিজাতশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক ইতিহাসের ঐতিহ্যবাহী পক্ষপাতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজের' প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে রণজিৎ গুহ বলেছেন,

> "The aim of the present collection of essays, the first of the series, is to promote a systematic and infromed discussion of subaltern themes in the field of south asian studies, and thus help to rectify the elitist bias characteristic of much research and academic work in this particular area… The dominant groups will therefore receive in these volumes the consideration they deserve without,…"
> (Guha (ed.) 1982, p. i)

১৯৮২ সালে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রথম খণ্ড থেকে চতুর্থ খণ্ড পর্যন্ত উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ভারতের 'তল থেকে ইতিহাস' লেখার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। যেখানে গ্রামশির ধারণাকে ভারতীয় ইতিহাসে প্রয়োগ করে দেখার ফলে বিভিন্ন সমালোচনার সৃষ্টি হয় এবং একই সঙ্গে দাবি উঠতে থাকে নতুন করে সমাজের তলদেশ থেকে সংশোধনবাদী ইতিহাস লেখার। প্রথম দিকে ব্রিটিশ মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার বিশ্লেষণাত্মক উপাদান ব্যবহার করা হলেও উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে কৃষকবিদ্রোহ বিষয়ক দীর্ঘ ঐতিহ্যকে ঐতিহাসিক বৃত্তির মধ্যে ফিরিয়ে আনার একটি নতুন প্রচেষ্টা দেখা দিল। ফলে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজের' এই প্রচেষ্টা ও সমালোচনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রথম বিতর্কের সৃষ্টি হল যা পরবর্তীকালে 'Arguments within Indian Marxism' নামে পরিচিতি পায়। ভারতীয় প্রতিক্রিয়ায় 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' ও মার্ক্সবাদের মধ্যে বিভেদরেখা লক্ষ করা যায়। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম চারখণ্ডে উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহের পটভূমি নির্মাণের ক্ষেত্রে একধরনের স্বায়ত্তশাসিত রাজনৈতিক চেতনা এবং সেই বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীদের নিজস্ব চরিত্র-চেতনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। (Chaturvedi (ed.) 2000, p. xi)

১৯৮৬ সালের মধ্যে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকল্পটি ভবিষ্যতে বিকাশের বিষয়ে একটি আভ্যন্তরীণ বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল যেখানে প্রকল্পটির মধ্যে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার দাবি করা হয়েছিল। আসলে কৃষক সচেতনতার প্রয়োজনীয় কাঠামোটিকে গুরুত্ব দিয়ে এবং ব্রিটেনের বৌদ্ধিক ইতিহাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একদল ঐতিহাসিক 'তল থেকে ইতিহাস' লেখার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং অন্যরা মার্কসবাদ পরবর্তী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে সমালোচনা করা শুরু করলেন। ফলত উত্তর-ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চায় স্পষ্ট একটি বিভাজন রেখা দেখা দেয়। এখানেই সাব-অলটার্নিষ্টদের সঙ্গে উত্তর-ঔপনিবেশিকবাদীদের পার্থক্য। শুধু তাই নয় মার্ক্সবাদের প্রভাবে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকল্পটির সূত্রপাত হলেও পরবর্তীকালে পশ্চিমী মার্ক্সবাদ থেকে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা সরে এসেছেন অনেকটাই। আসলে দক্ষিণ-এশিয়ার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা শুরু হলেও নব্বইয়ের দশকে ভারতীয় সমাজ-প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় একটি বাঁক বদল করেছিল। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা তাঁদের নিজস্ব একটি আদর্শ তৈরিতে সক্ষম হয়েছিল যা পরবর্তীকালে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' একটি সামাজিক তত্ত্ব কাঠামোয় পরিণত হয়েছে। রণজিৎ গুহের মৌলিক যুক্তি হল ইতিহাসবিদেরা বিভিন্ন দিক চর্চা করলেও কৃষক আন্দোলনের নির্দিষ্ট চেতনাকে বিবেচনা করেননি। তাঁরা কেবল কৃষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির অধ্যয়ন করেছেন।

রণজিৎ গুহ-র মতে, নব্য ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকতার ক্ষেত্রে ভারতীয় অভিজাতদের ক্রিয়াকলাপ ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যদিকে প্রশ্ন ওঠে প্রচলিত ভারতীয় মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিও কি সেটাই? মার্ক্সবাদী তত্ত্বের সঙ্গে সাব-অলটার্নিস্টদের সম্পর্ক কী? ‘Recovering the Subject : Subaltern Studies and Histories of Resistance in Colonial South Asia ’ প্রবন্ধে রোসালিন্ড ও’হ্যানলন জানাচ্ছেন,

> “…the teleologies of marxist historical writing have acted to empty subaltern movement of their specific types of consciouness and practice, and to see in the history of colonial South Asia ony the linear development of class consciousness. …As we shall see, by no means all of the contributors are free from the nation of a progression of consciousness, and a teleology which finds some resistances to be backward and primitive, and hence less congenial material for the historian to work on than those which are advance along the road to an enlightened awerness of class interest. A number of critics are made the point that this conflicts with the proclaimed interest in the historical specipicity of subaltern movements.” (Ludden (ed.) 2002, p.140-41)

আসলে যখন ‘তল থেকে ইতিহাস’ লেখার ধারণাটির সূত্রপাত হচ্ছিল তখন সমাজের তলদেশে থাকা মানুষদের অভিজ্ঞতাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ প্রকল্পটির উদ্ভাবন হয় যা অভিজাত ইতিহাসের নিচে এতদিন চাপা পড়ে ছিল। ‘Hidden from History’ (Ludden (ed.) 2002, p.143) বাক্যবন্ধটি শ্রুতিমধুর হলেও তা সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও শক্তিশালী ধারণাকে আড়াল করে রাখার কৌশলমাত্র। প্রকৃতপক্ষে অধস্তন এবং প্রান্তিক নারীবাদের অন্ধকারের ইতিহাসকে আলোকিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এ সমাজের অন্ধকার দিকটির প্রতি তাঁদের অনুমানগুলির অপর্যাপ্ত বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে চাপা পড়ে যাওয়া অভিজ্ঞতার পুনরুদ্ধারের কাজটি কীভাবে সম্পন্ন হবে তার বিস্তৃত ধারণা তৈরি করেছেন। ইতিহাসের এই শূন্যস্থান পূরণ করার কাজটি করা হয়েছে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এ। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাই বলেছেন,

> “The task now is to fill up this emptiness, that is, the representation of subaltern consciousness in elitist historiography. It must be given its own specific content with its own history and development… Only then can we recreate not merely a whole aspect of human history whose existence elitist historigraphy has hitherto denied, but also the history of the ‘modern’ period, the epoch of capitalism.” (Ludden (ed.) 2002, p.144)

ইতিহাসের শূন্যতাকে পূরণ করার কাজটি কীভাবে সম্পাদন করা হবে এই নিয়ে নিম্নবর্গের ইতিহাসে নিম্নবর্গের উপস্থিতি একটি অন্তর্নিহিত ও প্রতিরোধী বিষয় হিসাবে দেখা হয়েছে। যেখানে ঐতিহাসিকেরা নিম্নবর্গের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য সচেতন ও উদার মানবতাবাদের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এটি এমন একটি ইতিহাস রচনার দাবি করে যেখানে নিম্নবর্গই তাঁদের নিজস্ব চেতনা,

দাবি, আদর্শ, অনুশীলন ও অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরতে চায়। যে ইতিহাস কোনো বাহ্যিক নেতৃত্ব বা অভিজাতরা নিম্নবর্গকে প্রদান করেনি, এই ইতিহাস নিম্নবর্গের চেতনা ও অনুশীলনের একটি উপায় যার উৎস ক্ষমতার বিপরীতে নিম্নবর্গের নিজস্ব সত্তা পুনরুদ্ধার করে।

১.৪.৩ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' : ঐতিহাসিক সমালোচনায় তাত্ত্বিক উত্তরণ

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' (১৯৮২) প্রকাশিত হওয়ার পর সমালোচকদের নানা মতবাদ ও সমালোচনার দরুন আলোচ্য প্রকল্পটি বিংশ শতাব্দীর শেষে ঔপনিবেশিক ভারত ও জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সমালোচনা তত্ত্বে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যবাদের উদ্বেগ ও নতুন আন্তর্জাতিক সামাজিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় পুঞ্জীভূত শক্তি দ্বারা বহুকাল ধরে চলে আসা আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক নির্ধারণবাদ, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতিগত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিরোধমূলক সম্মিলিত এজেন্সি গঠনের সাক্ষ্য বহন করে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'। (Chaturvedi (ed.) 2000, p. xii)

১৯৮২-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত যে সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজে' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যার পেছনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।

> "… first, as the members of the collective emphasize their own 'autonomous voices' within the project, it was pertinent to select essays which were published indipendently of the series and reflected theoretical shifts in the1980s and 1990s ; second, by presuming an audience which was already familiar with the original essays found in the pages of Subaltern Studies,… The essays are organized according to the intellectual trajectory of the project. Theoretical statements from the members of the Subaltern Studies collective are followed in sequence with critiques, there by providing a historical framework for the discussions and debates centring on the project."
>
> (Chaturvedi (ed.) 2000, p. xiv)

অর্থাৎ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজে' সংগৃহীত প্রবন্ধগুলি সমালোচনার বিষয়, ধরন, তত্ত্ব ও তথ্য অনুযায়ী ক্রমানুসারে স্থান পেয়েছে যাতে নিম্নবর্গের ইতিহাস পর্যালোচনায় একটি বৌদ্ধিক ও বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়। ফলে রণজিৎ গুহ-এর নেতৃত্বে গঠিত সমালোচকগোষ্ঠী নিম্নবর্গের ধারণাকে যেভাবে সমালোচনা করেছেন সেখানে ধীরে ধীরে সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টির পাশাপাশি একটি তাত্ত্বিক পরিসর তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজের' সঙ্গে জড়িত সমালোচকদের তাত্ত্বিক-সমালোচনা ও অভিমতগুলিকে সমালোচক-প্রাবন্ধিক ডেভিড লাডেন তিনটি ভাগে (Ludden (ed.) 2002, p.index) বিভক্ত করেছেন। তাঁর এই বিভাজনকে স্মরণে রেখে সমালোচনা ও অভিমতগুলি আমরা

সামগ্রিকভাবে তিনটি স্তরে বর্ণনা করার চেষ্টা করব। আলোচনার সুবিধার্থে সমালোচনাগুলি আমরা নিম্নরূপে বিভাজন করেছ। যেমন-

প্রথম স্তর : উন্মেষ পর্বের তাত্ত্বিক-সমালোচনা ও অভিমত
দ্বিতীয় স্তর : মধ্য পর্বের তাত্ত্বিক-সমালোচনা ও অভিমত
তৃতীয় স্তর : সাম্প্রতিক পর্বের তাত্ত্বিক-সমালোচনা ও অভিমত

১.৪.৩.১ উন্মেষ পর্বের তাত্ত্বিক-সমালোচনা ও অভিমত

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'- গোষ্ঠীর প্রধান রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার পূর্বে তিনি যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর প্রথম বই 'A rule of property for Bengal : An essay on the idea of permanent settelement'(১৯৬৩) এবং দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মনোগ্রাফ হল 'Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India'(১৯৮৩) যা ভারতবর্ষের কৃষক বিদ্রোহের দিকগুলির উপনিবেশ শাসনকালে একটি সূক্ষ্ম প্রতিরোধের তত্ত্ব উদ্ভাসিত করে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকাশের সময় সাবঅলটার্ন-এর অর্থ সংকুচিতই ছিল। গ্রামশির 'সাবঅলটার্ন' শব্দটির অর্থ রণজিৎ গুহ নিম্নস্থিত বা শূন্যতা বুঝেছিলেন। (Guha (ed.),1982 : i) তিনি 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজের' ভূমিকায় জানিয়েছেন,

> 'The project's ambition to rectify the elitist bias in a field dominated by elitism colonialist ditism and bourgeois- nationalist elitism.' (Guha (ed.) 1982, p. i)

রণজিৎ গুহ পরামর্শ দেন যে ভারতের সম্পর্কে ঐতিহাসিক রচনাকে প্রতিষ্ঠা দিতে গেলে কৃষক বিদ্রোহের ওপর জোর দিতে হবে এবং ক্ষমতার সম্পর্ককে বুঝতে গেলে কৃষক ও তাঁদের বিদ্রোহের ইতিহাসকে বাদ দেওয়া যাবে না। 'Dominance without hegemony : History and power in colonial India'(১৯৯৭) রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক ভারতের ক্ষমতার বিষম বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে হেজেমনিকে ব্যাখ্যা করে আধিপত্য ও অধীনতার বিপরীত ভাবনা থেকে ক্ষমতার স্বরূপ নির্ধারণে সচেষ্ট হয়েছেন। (Guha 1997, p.23-29) নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক গোষ্ঠী এই ধরনের আধিপত্যকে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে উপনিবেশ গঠনের লক্ষ্যে ভারতীয় সমাজ কাঠামোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকটিকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রভুত্ব স্থাপন করেছে। এখানে গ্রামশি কথিত হেজেমনির লক্ষণ ক্ষমতার বিষম বিন্যাসের প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা হয়েছে।

কারণ ঔপনিবেশিক ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি সমাজ ও স্থান ভেদে ভিন্ন। ইংরেজ শাসনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে উন্নত করার আশা দেখিয়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

লক্ষণীয় ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বুকে আধুনিক সমাজ ও ইতিহাস গড়ার জটিল দলিল-দস্তাবেজগুলিকে ভিন্নদৃষ্টিতে সমালোচনা করার লক্ষ্যে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর সূত্রপাত হয়েছে। তাঁরা সেই সব গবেষকদের মতো উচ্চবর্গের শরণাপন্ন হননি, বরং সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের বিরোধিতা করে তাদের অপর প্রান্তে অবস্থিত নিম্নবর্গের সমাজ-সংস্কৃতি, স্বকীয়তা ও সর্বোপরি তাদের স্বতন্ত্র চেতনার সমালোচনা করেছেন। নিম্নবর্গকে বিচার করতে গেলে উচ্চবর্গ ধারণাটিকে বাদ দিলে চলে না। একেই 'দ্ব্যণুক' বা 'বাইনারি' (Guha (ed.) 1982, p.i) সম্পর্ক বলে বোঝাতে চাইছেন ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ। যদিও ক্ষমতা প্রসঙ্গে গৌতম ভদ্র একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> "কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাই একমাত্র ক্ষমতা নয়। কিন্তু 'বিকীর্ণ ক্ষমতা' প্রতিনিয়ত আমাদের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জন্ম হচ্ছে। আমরা শুধু কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার কথা বললে, আমরা শুধু তার স্ট্রাটেজির কথা ভাবি। তার সঙ্গে কীভাবে লড়াই করতে হবে কিন্তু আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কে যে বিকীর্ণ ক্ষমতা তৈরি হয়, ছাত্র-শিক্ষক, বাড়িতে-রাস্তায়, সাধারণ স্বাভাবিক আদান প্রদানে, সেই ক্ষমতার আমরা কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারিনি। যার ফলে ক্ষমতার সম্পর্ক চলতেই থাকে...।" (মহম্মদ (সম্পা.) ২০০৪, পৃ. ৪৪)

আসলে ক্ষমতার সম্পর্কই শুধু নয়, আধিপত্যের অভিজ্ঞতা এবং উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবহ নিম্নবর্গের চেতনার ধারণাটিকে বুঝতে সাহায্য করে। নিম্নবর্গের ইতিহাস সম্পর্কে রণজিৎ গুহ যে বিশেষ তাত্ত্বিক দিকগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা নিম্নরূপ-

- ঔপনিবেশিক সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে প্রভু ও অধীনের সম্পর্কটি যে বিশিষ্ট রূপে প্রকট হয় তা শোষক-শাসিতের সম্পর্ক।
- ঔপনিবেশিক সমাজে নিম্নবর্গের ইতিহাসে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বলে কিছু নেই। পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজের মতো সেখানেও অর্থনীতির অন্তর্গত সব সম্পর্ক আসলে ক্ষমতার সম্পর্ক বা স্পষ্ট করে বললে রাজনীতির সম্পর্ক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত।
- নিম্নবর্গের অন্তর্গত সমস্ত জাতি ও শ্রেণিকে সচেতনভাবে নিম্নবর্গের ইতিহাসের আলোচনায় স্থান দিতে হবে। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক সমাজে প্রভুত্ব ও অধীনতার বিষয়টি যাদের জীবনে প্রবল অর্থাৎ আদিবাসী, নিম্নবর্ণ ও নারীদের প্রতি উল্লেখযোগ্যভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। তবেই উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের অপরায়ন পদ্ধতির সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে।

- নিম্নবর্গের ইতিহাস আলোচনায় অধীনতার চরিত্রটির স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কারণ প্রভুত্ব-অধীনতা সম্পর্কটি বৈপরীত্যের সূত্রে বাঁধা। অধীনতাও একটি দ্ব্যণুক সত্তা যা সহকারিতা ও প্রতিরোধের বৈপরীত্যে গড়া। নিম্নবর্গের ইতিহাসে অধীনতার এই দুই বৈপরীত্য সক্রিয়ভাবে উপস্থিত। অবস্থাভেদে কখনো সহকারিতা আবার কখনো প্রতিরোধ গড়ে ওঠে নিম্নবর্গের মধ্যে। তাই শুধুমাত্র প্রতিরোধকেই নিম্নবর্গের একমাত্র চৈতন্য ধরে নেওয়া ঠিক হবে না।
- নিম্নবর্গের চৈতন্যের আরেকটি লক্ষণ হল তাদের ধর্মভাব। ধর্মভাব বলতে ধর্মীয় সংস্কার বা দৈব আরাধনা নয়, ধর্মভাব বলতে সেই চেতনা যা জড় ও জীবের সত্তার সঙ্গে বাস্তবের ভাবনাকে যথার্থ ভাবে ধারণার মধ্যে আনতে পারা। এই ধারণা আনতে না পারাই নিম্নবর্গের রাজনীতির ব্যর্থতা ও প্রধান উপাদান।

নিম্নবর্গের চেতনার মধ্যে একদিকে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ও অন্যদিকে বাস্তবে সেই আশা সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ও দুর্বলতার এই দ্বন্দ্বই তাদের চিন্তা-চেতনার ধর্মভাবকে কায়েম করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, রণজিৎ গুহ এমন এক ইতিহাস রচনার দাবি করেছেন যেখানে নারীরা সমাজের আংশিক কণামাত্র নয়, যারা ঔপনিবেশিক ভারতে আদিবাসী বা কৃষক আন্দোলনের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনাকালে অর্থনৈতিক কাঠামোয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য যে শাসক ও শোষিতের সম্পর্ক বজায় থাকে এবং শাসক দ্বারা শোষিতকে বঞ্চনা ও নিপীড়িত করার যাবতীয় সমস্যাগুলিকে বিশেষ করে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে রণজিৎ গুহ মনে করেন। অন্যদিকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ধারণা ও নিম্নবর্গের ইতিহাস বিশ্লেষণ সম্পর্কে বলেন-

> ‘এর সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে সামাজিক সম্পর্কের সেই সমতলে যেখানে ক্ষমতাই হল মূল কথা। অর্থাৎ যেখানে প্রভুত্ব/ অধীনতার এক বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কটি বাঁধা থাকে। সুতরাং উচ্চবর্গ/ নিম্নবর্গ ধারণাটির অবস্থান উপাদান সম্পর্কের সমতলে নয়। বরং বলা যায়, ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অসম বিকাশকে চিত্রিত করার প্রয়োজনে উপাদান সম্পর্কের সম্পূরক একটি ধারণা এটি। ফলে উচ্চবর্গ/ নিম্নবর্গের বিশ্লেষণ পদ্ধতি উৎপাদন- রীতির ধারণাটিকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না।’ (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৭)

প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর “More on Modes of Power and the Peasantry” প্রবন্ধে। তিনি মার্কসীয় তত্ত্ব ও ফুকোর ক্ষমতার ধারণার প্রসঙ্গ টেনে ক্ষমতার বিভিন্ন রীতি বা প্রথাগুলিকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন।

> “I defined three modes of power which could exist, even coexist, in a perticular state formation. These modes are distinguished in terms of the basis of specification of the ‘property’ connection (the relations of production) in the ordered and the repeated performance of social activities, i.e, the

> perticular pattern of allocation of rights or entitlements over material objects…within a definite system of social production. The three modes of power I called the communal, the feudal and the bourgeois modes." (Guha (ed.) 1983, p.317)

সমাজ কাঠামোর সমতলে যেখানে ক্ষমতাই মূলকথা সেখানে ক্ষমতার বিভিন্ন প্রথার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র গঠনের রীতি নির্দিষ্ট হয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় কথিত সাম্প্রদায়িক ক্ষমতা, সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা ও বুর্জোয়াসি ক্ষমতা হল সেই রাষ্ট্র গঠনের রীতি বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিকগণ যতই সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য বা বিরোধিতা করুন না কেন, সেই ইতিহাস থেকে নিম্নবর্গের চেতনাকে উদ্ধার করতে গেলে উচ্চবর্গ ধারণাটিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন,

> 'উচ্চবর্গ/ নিম্নবর্গ শব্দ দুটি শাসক শ্রেণী/ শাসিত শ্রেণীর প্রতিশব্দ হিসেবেও সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলে না। কারণ অসম বিকাশের অবস্থায় সামাজিক ক্ষমতা সবসময় আইন বদ্ধ রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা হিসেবে প্রতিপন্ন নাও হতে পারে।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৭)

সাবঅলটার্ন স্টাডিজ-এর প্রাথমিক সমালোচনায় শাহিদ আমিন, ডেভিড হার্ডিম্যান, ডেভিড আর্নল্ড, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, গৌতম ভদ্র, স্টিফেন হেনিংহ্যাম, এন. কে চন্দ্র প্রমুখেরা ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও চেতনা, মার্ক্সবাদের নিরিখে রাজনৈতিক অবস্থানের পর্যালোচনা, নিম্নবর্গের অবস্থানের তাৎপর্য এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিম্নবর্গের ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়ে উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের অবস্থান, অবদান ও ইতিহাসের নায়ক হিসাবে নিম্নবর্গকে প্রদর্শিত করা হয়েছে।

১.৪.৩.২ মধ্য পর্বের তাত্ত্বিক-সমালোচনা ও অভিমত

নিম্নবর্গের সমালোচকদের মধ্যে বিশেষভাবে যার নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট তাত্ত্বিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর চতুর্থ খণ্ডে (১৯৮৫) তাঁর 'Subaltern Studies : Deconstructing Historiography' এবং সেই বছরই প্রকাশিত তাঁর বিতর্কমূলক "Can the Subaltern speak?" প্রবন্ধ দুটি নিম্নবর্গের ইতিহাস সমালোচনায় বাঁক বদল করেছে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম পর্বের কাজের সবচেয়ে মৌলিক সমালোচনা করেছিলেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর আলোচ্য দুটি প্রবন্ধে। তিনি প্রশ্ন তুললেন,

> "ইতিহাস যখন দেখিয়ে দিচ্ছে যে নিম্নবর্গ মানেই 'কোনো এক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি', তখন নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা আলাদা করে বিশুদ্ধ কৃষকচৈতন্য অথবা একান্তভাবে স্বতন্ত্র নিম্নবর্গের রাজনীতিকে কেন প্রদর্শিত করতে চাইছেন? ...নিম্নবর্গের ইতিহাসে 'নিম্নবর্গ'-কে "আর-একটি সার্বভৌম কর্তার পোশাক পরিয়ে ইতিহাসের নায়ক হিসেবে উপস্থিত করার প্রয়োজন কী? ... ঐতিহাসিকের লেখার ভেতর দিয়ে নিম্নবর্গ তার নিজের কথা বলবে, এটা তো নিতান্তই

> গল্পকথা।... আসলে তো ঐতিহাসিক নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্ব করছেন মাত্র।... নিম্নবর্গ তার নিজের কথা কখনোই বলতে পারে না।” (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.১৭)

স্পিভাক তাঁর প্রবন্ধে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এর গবেষণা পর্যবেক্ষণ করে নিম্নবর্গের সমালোচকদের কাছে আশা করেছেন যে তারা নিম্নবর্গের অবস্থান নির্ধারণে জোর না দিয়ে বরং উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের নির্মাণ প্রক্রিয়া নিয়ে বিশদে আলোচনা করুন। কারণ সমগ্র সমাজে নিম্নবর্গের স্বকীয় কণ্ঠস্বরকে পৃথকভাবে সন্ধান করা অর্থহীন। (Ashcroft (ed.) 1995, p.27) অন্যদিকে স্পিভাক নিম্নবর্গের চেতনাকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন সমালোচকেরা চেতনা ব্যাখ্যার পক্ষে সংবেদনশীল। তাঁদের মতে নিম্নবর্গীয় চেতনার মধ্যে রয়েছে আত্ম-প্রতিরোধ এবং একই সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার চেতনা যাকে কাজে লাগিয়ে উচ্চবর্গ কৌশলগত কাঠামোয় তাদের চালিত করে। স্পিভাক তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে বলেন,

> “The strategy becomes most useful when ‘consciousness’ is being used in the narrow sense, as self-consciousness. When ‘consciousness’ is being used in that way, Marx’s notion of unalienated practice or Gramsci’s notion of an ‘ideological coherent’, ‘spontaneous philosophy of the multitude’ are plausible and powerful.” (Landry (eds.) 1996, p.216)

অন্যদিকে, “Can the Subaltern speak?” প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি জোরালো বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে নিম্নবর্গের ইতিহাস আলোচনায়। কারণ স্পিভাক মনে করেন নিম্নবর্গের নিজস্ব কোনো স্বর নেই এবং এক্ষেত্রে মহিলারা আরো বেশি অসহায় ও অবহেলিত। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর বিতর্কমূলক মন্তব্য ‘The subaltern cannot speak’ (Chakraborty Spivak 1985, p.118) অনেকগুলি অন্তর্নিহিত অর্থ বহন করে। আসলে নিম্নবর্গের সে ক্ষমতা রয়েছে যার দ্বারা কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য যে কোনো পর্যায়ে তারা যেতে পারে। আসল সমস্যাটি রয়েছে প্রাপকের মধ্যে কারণ তিনি প্রেরকের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত নন বা বলা ভালো প্রাপক বার্তা শোনার জন্য আগ্রহী নন। অর্থাৎ প্রেরকের বার্তাটি ‘ডিকোড’ করার মতো অবস্থানে প্রাপক নেই। তাই একজন নিম্নবর্গ যখন কথা বলতে চেষ্টা করে তখন তার মধ্যে সুপ্ত যোগাযোগের উপাদান বিশেষভাবে কাজ করে এবং শব্দের উপাদান বিকৃত হয়ে বার্তার যথাযথ অভ্যর্থনা প্রাপকের কাছে পৌঁছয় না। এমন ঘটনা সামজিক কারণেই ঘটে এবং অবশ্যই একটি অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক দিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় কারণগুলিও এর জন্য দায়ী। যখন একজন নিম্নবর্গ কথা বলে তখন তার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গটি খুব কমই কার্যকর হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মহিলারা চারদেওয়ালের মধ্যে বন্দি ছিল, তাদের কথা বলার সুযোগ ছিল কম, বাইরের জগৎ ও শিক্ষার আলো থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। অশিক্ষা বা

নিরক্ষরতা তাদের মনে সর্বদা একপ্রকার হীনমন্যতা সৃষ্টি করত। শিক্ষার অভাবে তারা মার্জিত ও সুসজ্জিত ভাষা প্রয়োগ করে অপরকে প্রভাবিত করতে পারত না। এমনকি তারা কিছু বলার পরেও বার্তাটির লেনদেন সঠিকভাবে হয় না এবং অন্যদেরকেও তাদের অবস্থান বোঝাতে পারে না। ক্ষতি বা বিপদের আশঙ্কায় গর্জনকারী উচ্ছ্বাসের মধ্যে মহিলারা কথা বলার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু অপরের কাছে তার কথা শোনার ধৈর্য নেই। যখন বক্তা শ্রোতাকে বোঝাতে সক্ষম হয় না তখনই যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। নিম্নবর্গকে কথা বলার সুযোগ ও স্থান দেয় না সমাজ।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের আলোচ্য প্রবন্ধের ‘স্পিক’ (Speak) শব্দটির সঙ্গে কোনো কোনো সমালোচক ‘টক’ (Talk) শব্দটির তুলনা করার ফলে আরো একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়। স্পিভাক তাঁর প্রবন্ধের ধারণাটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে অনুশোচনা করেছেন। আসলে ‘speak’ এবং ‘talk’ শব্দ দুটি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ কমপক্ষে একজন শ্রোতার সামনে যখন কথা বলা হয় তখন ‘speak’ শব্দটি অনেক বেশি সক্রিয়ভাবে অবস্থান করে, সেখানে বক্তার স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষণীয়। শব্দটিতে ব্যক্তির অন্তরের যোগাযোগ স্থাপন হয় এবং তার প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক। এই ধরনের যোগাযোগে একজন ব্যক্তি তার মুখের ভঙ্গিমা ও প্রতিক্রিয়া দেখানোর সুযোগ পায় যাতে সেই যোগাযোগ আরো বেশি প্রভাবিত হয়। অন্যদিকে ‘talk’ শব্দটি আন্তঃব্যক্তি যোগাযোগের আওতায় পড়ে। এটি একটি অভিনয় নিজের সঙ্গে কথা বলার। এ জাতীয় অভিব্যক্তিগুলি অপরের দ্বারা শোনার নয়। যেমন- ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতি। (Landry (eds.) 1996, p.215) শুধু তাই নয় ‘speak’ শব্দের বদলে ‘talk’ শব্দের ব্যবহারের ফলে যে সমস্যার উৎপত্তি হয় সেদিকেও তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ডোনা ল্যান্ড্রি ও গেরাল্ড ম্যক্লিন নেওয়া সাক্ষাৎকারে স্পিভাক বলেন,

> “Problems arise if you take this ‘speak’ absolutely literally as ‘talk’. There can be and have been attemps to correct me by way of the fact that some of the women on the pyres did actually utter. Now I think that is a very good contribution, but it really doesn’t actually touch what I was trying to talk about.” (Landry (eds.) 1996, p.291)

সমালোচক রোসালিণ্ড ও’হ্যানলন-এর মতে, ঔপনিবেশিক ভারতে নিম্নবর্গের পরাধীনতার ধারণা, অধীনতার অভিজ্ঞতা এবং নিম্নবর্গ দ্বারা সম্মিলিত প্রতিরোধ ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-প্রকল্পটির একটি প্রধান আলোচনার দিক তৈরি করেছে। তাঁর মতে এই আলোচনার মূলে একধরনের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা ও নিম্নবর্গের একটি প্রতিরোধী উপস্থিতি খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনীয়তার মধ্যে নিম্নবর্গের অনন্যতা সংরক্ষণ করার প্রবণতা রয়েছে। তিনি মনে করেন, ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এর প্রাথমিক পর্বের

আলোচনায় ঔপনিবেশিকতা, জাতীয়তাবাদ ও মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনা, ও তাদের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধকে পৃথকভাবে আবিষ্কার বা পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে সমালোচকেরা নিম্নবর্গের নারী ও নারীবাদ, জাতিভেদ প্রথা, তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে ততটা গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেননি প্রাথমিক পর্যায়ে। (Ludden (ed.) 2002, p.149) অন্যদিকে তিনি রণজিৎ গুহ কথিত উচ্চবর্গ দ্বারা নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার প্রত্যাখ্যান, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষমতা প্রসঙ্গে মতামত, নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনা বিষয়ক আলোচনা ও সর্বোপরি ‘তল থেকে ইতিহাস’ রচনার প্রসঙ্গ টেনে যা কিছু সত্য ও তথ্য ইতিহাসে আড়াল করা হয়েছে যা আসলে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনায় বাধা দান করে সেই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। বিশেষত নিম্নবর্গীয় নারীকে ইতিহাসে কোনো জায়গা দেওয়া হয়নি যা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন। ফলে তিনি নিম্নবর্গের সমালোচকদের কর্তব্য হিসাবে আশা করেন,

> “The Subaltern contributors would, I think, accept the argument that their won project has been cast in these terms : that they have come together in an effort to recover the experience, the distinctive cultures, traditions, identities and active historical practice of subaltern groups in a wide variety of settings- traditions, cultures and practice which have been lost or hidden by the action of elite historiography.” (Ludden (ed.) 2002, p.142-43)

এছাড়াও জিম মেসেলস, কে. শিবরামকৃষ্ণন, ফ্রেড্রিক কুপার, হেনরি শয়ারজ প্রমুখ সমালোচকেরা যথাক্রমে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এ নিম্নবর্গের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি, ইতিহাস ও নৃবিজ্ঞানের নিরিখে নিম্নবর্গের অবস্থান, ঔপনিবেশিক আফ্রিকার ইতিহাসের সঙ্গে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ এর বিভেদ ও যোগাযোগ এবং নিম্নবর্গের রূপকায়িত ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা করেছেন যা পরবর্তীকালে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’এর আলোচনাকে একাডেমিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে।

১.৪.৩.৩ সাম্প্রতিক তাত্ত্বিক-সমালোচনা ও অভিমত

‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এর সাম্প্রতিক সমালোচনায় দীপেশ চক্রবর্তী, কে.বালগোপাল, বিনয় বাহাল, সুমিত সরকার প্রমুখ সমালোচকেরা তাদের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ ও যুক্তি পরামর্শ প্রদান করেছেন। বিশেষ করে সুমিত সরকারের ‘The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies’ (Chaturvedi (ed.) 2000, p.300) প্রবন্ধটি সমালোচনার জগতে বহুচর্চিত ও আলোচিত হয়েছে। ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনায় ভারতীয় সমাজে সুবিধাবঞ্চিত কৃষক, আদিবাসী এবং শ্রমিক বা কর্মীরা আলোচ্য বিষয় ছিল। যেখানে গ্রমাশির ধারণা, মার্ক্সীয় ধারণা সম্পৃক্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু আজ

আলোচ্য প্রকল্পটি পশ্চিমী-সমালোচনার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঔপনিবেশিক শক্তি ও জ্ঞানের প্রভাবশালী মূল্যবান বিকল্প হিসাবে আলোচিত হচ্ছে।

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকল্পের দুই দশক কেটে যাওয়ার পরও 'সাবঅলটার্ন' শব্দটির অর্থগুলির স্থানান্তরিতকরণ ও আভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণের জন্য সমালোচকেরা কেন এত বেশি আশাবাদী বা নিম্নবর্গ বিষয়টি একটি ভিন্ন বিতর্কিত প্রসঙ্গ সত্ত্বেও 'সাবঅলটার্ন' শব্দটিকে কেন ধরে রাখার প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে—এই জিজ্ঞাসা ছিল সমালোচক সুমিত সরকারের। (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 305) আশি দশকের গোঁড়ার দিকে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' এর আলোচনা গোঁড়া মার্কসবাদী অনুশীলন ও একটি তীব্র সমাজতান্ত্রিক মার্ক্সীয় দিগন্ত ধরে রাখার সঙ্গে মিলিত ছিল।

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' এর শুরুতেই কোনো কোনো সমালোচক অনুভব করেছিলেন পূর্বসূরিদের সমালোচনা ও তাদের দাবি থেকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করার। ফলে অনেকেরই মনে হতে পারে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' এর কাজ অনেকটা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা, কিন্তু তা আসলে ইতিহাসের বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের সংকল্প। একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কৃষকের বিদ্রোহী-চেতনা, অন্তর্নিহিত কাঠামো ও ঔপনিবেশিক নিয়মের অনালোচিত, আড়াল করা ইতিহাসে আলো ফেলেছে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'।

সমালোচক সুমিত সরকার তাঁর 'The decline of the Subaltern in Subaltern Studies' প্রবন্ধে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর মতামতগুলির সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতের অভিমুখ মূলত দুটি।

প্রথমত,

> "…for it needs to be imphasized that the bulk of the history written by mordern Indian historians has been nationalist and anti-colonial in content, at times obsessively so. Criticism of Western cultural domination is likewise nothing particularly novel….

দ্বিতীয়ত,

> Here the second kind of misrecognition comes in, for in the Western context there is certain, though much exaggerated, novelty and radicalism in the saidian exposure of the colonial complicity of much European schoralship and literature. Such blindness has been most obvious in the discipline of literary studies, in the West as well as in the ex-colonial world, and it is not surprising that radically inclined intellectuals working in this area have been perticularly enthusiastic in their response to late Subaltern Studies." (Chaturvedi (ed.)2000, p.314-15)

তাহলে এ পর্যন্ত আলোচনায় প্রশ্ন আসে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ প্রকল্পটি আজ কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে? বিভিন্ন সমালোচকবৃন্দের মননঋদ্ধ আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ প্রকল্পটির আসল কাজটি বুঝতে হলে এর মধ্য থেকে একটি বিষয় উঠে আসে –

> “The original project- as understood here as one that effects a relative separation between the history of capital and that of power- has been developed and furthered in the work of the group.”
> (Schwarz (eds.) 2005, p.480)

আলোচ্য প্রকল্পের প্রথম দুটি খণ্ডে ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক-বিদ্রোহের চেতনার স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্রতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রণজিৎ গুহ দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিক ভারতে গণআন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহের স্বকীয় চেতনা, পার্থ চট্টোপাধ্যায় রবার্ট ব্রেনারের সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদ উত্তরণের দৃষ্টি ভঙ্গিতে নিম্নবর্গের বিচার করতে চাইলে তাঁর প্রতিউত্তরে মিশেল ফুকোর ক্ষমতার ধারণার উল্লেখ করে ঔপনিবেশিক ভারতে ক্ষমতার স্তরায়ন আলোচনার করার চেষ্টা করেছেন, শুধু তাই নয়, তিনি বিশদে রণজিৎ গুহের অভিমতের রেশ টেনে ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষকচেতনা ও নারীর অবস্থান বিষয়ক আলোচনা করেছেন, ডেভিড আর্নল্ড দেখান ১৯২৪-৩৯ সালে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে গুডেন রাম্পার উত্থান কাহিনি ও তাদের প্রতিবাদী চেতনাকে। ডেভিড হার্ডিম্যান দেখিয়েছেন পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় ঔপনিবেশিক ভারতের গুজরাট রাজ্যে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, গৌতম ভদ্রের আলোচনায় উঠে এসেছে আঠারো ও উনিশ শতকের বঙ্গদেশের কৃষক সমাজ, জ্ঞান পাণ্ডে আলোচনা করেছেন ১৯১৯-১৯২২ সালে অযোধ্যার কৃষক বিদ্রোহ তাদের স্বকীয় চেতনা, দীপেশ চক্রবর্তী লিখেছেন ১৮৯০-১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভারতের শ্রমজীবীর অবস্থান, সরকারি কর্মচারী এবং কলকাতার পাটকল শ্রমিকদের অবরোধ বিরোধ সম্পর্কে। আলোচ্য এই লেখাগুলি প্রকল্পটির কার্যকারিতা ও ব্যাখ্যামূলক ঐতিহাসিক উদাহরণ যা সম্ভবনাময় একটি মৌলিক তাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক দিক গড়ে তুলেছে। ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এর উদ্দেশ্য ও তাত্ত্বিক পরিসরের শেষ টানা যেতে পারে ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তীর মন্তব্য দিয়ে।

> “At the same time, it has to be acknowledge that Subaltern Studies has exceeded the original historiographical agenda that it set for itself in the early 1980s. The series, as I said at the outset, now has both global and even regional locations in the circuits of schoralship that it traverses. This expansion beyond the realms of Indian history has earned for the series both praise and criticism which fall outside the scope of the present discussion. The point of this exercise has been to rebut the charge that Subaltern Studies lost its original way by falling into the bad company of postcolonial theory. I have sought to demonstrate-through a discussion of what Guha (ed.) wrote in

> the 1980s- some necessary connection between the original aims of the Subaltern Studies and current discussion of postcoloniality. ” (Schwarz (eds.) 2005, p. 480)

১.৫ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় নিম্নবর্গীয় চেতনা

‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ যদি কেবল ‘তল থেকে ইতিহাস’ লেখার পরিকল্পনা গ্রহণ করত তাহলে এর মধ্যে কোনো অভিনবত্ব থাকত না। আমরা লক্ষ করলাম, ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ শুধুমাত্র নিম্নবর্গচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আলোচনা যত অগ্রসর হয়েছে ততই উক্ত ইতিহাসচর্চার মধ্যে ঔপনিবেশিকতা, উত্তর ঔপনিবেশিকতা, আধুনিকতা, উচ্চবর্গ বা অভিজাতদের সঙ্গে নিম্নবর্গের সম্পর্ক, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোয় নিম্নবর্গের অবস্থান, উচ্চবর্গের রাজনীতির সঙ্গে নিম্নবর্গের রাজনীতির পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষ করে উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের নির্মাণ কীভাবে করা হয়েছে—সেই বিষয়গুলি উঠে এসেছে।

আমরা জানি নিম্নবর্গের সমালোচকরা কখনো এই দাবি করেননি যে- তারা কেবল নিম্নবর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে ইতিহাস রচনা করবেন। এমনটা হলে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার কোনো অর্থই থাকত না। কিন্তু তারা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ক্ষমতা ও অধীনতার সম্পর্কসূত্রে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি পুঁজিবাদ ও শ্রমের দ্বন্দ্ব প্রদর্শিত করে ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ, রাজনীতি ও নারীর অবস্থান বিষয়ক যাবতীয় তথ্য অনুসন্ধান করেছেন।

নিম্নবর্গের স্বকীয় কণ্ঠস্বর অনুসন্ধানকালে ঐতিহাসিকগণ নিম্নবর্গের দিকে ঝুঁকলেও ‘ইতিহাসের নায়ক’ হিসেবে নিম্নবর্গকে প্রতিপন্ন করা তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না বরং উচ্চবর্গের দ্বারা নিম্নবর্গের নির্মাণ কীভাবে ঘটছে তা মূল বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ফলে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ শুধু তল থেকে ইতিহাস লেখার গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে উচ্চবর্গের ক্ষমতাচর্চার বিষয়ও হয়ে উঠল।

‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এ নিম্নবর্গীয় চেতনা বিষয়ক আলোচনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক পদ্ধতির পার্থক্য এবং নিম্নবর্গীয় চেতনার নিজস্বতা বিষয়টি উঠে আসে। প্রশ্ন আসে, নিম্নবর্গের রাজনীতির এই স্বতন্ত্রতা কোনো নিয়মে বা সূত্রে নির্ধারিত হয়? এর উত্তর দিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

> “নিম্নবর্গের রাজনীতির চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার রূপরেখা অনুসারে। সেই চেতনা গড়ে উঠেছে অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে। দৈনন্দিন দাসত্বও, শোষণ আর বঞ্চনার মধ্যেও নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় থাকার

> সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। ... ঐতিহাসিক নথিপত্রে নিম্নবর্গের চেতনার সরাসরি সাক্ষ্য প্রায় কোথাওই পাওয়া যায় না। কারণ সেই নথি তৈরি করেছে উচ্চবর্গেরা।" (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.১২)

অর্থাৎ নিম্নবর্গীয় চেতনাকে ঐতিহাসিকেরা পৃথক হিসেবে দেখতে চান কারণ অধীনতার অভিজ্ঞতা কেবল নিম্নবর্গেরই রয়েছে, তা উচ্চবর্গের নেই এবং নিম্নবর্গীয় চেতনার স্বকীয়তা ধরা পড়ে তাদের রাজনৈতিক পদক্ষেপ ও সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে। উচ্চবর্গের ঐতিহাসিকেরা নিম্নবর্গের এই চেতনাকে অস্বীকার করে বা অজান্তেই উচ্চবর্গীয় চেতনার কাঠামোয় নিম্নবর্গীয় চেতনাকে পরিমাপ করতে চান। এই অবকাশে নিম্নবর্গীয় চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে নেওয়া যাক।

- নিম্নবর্গ চেতনা একই সঙ্গে আনুগত্য ও প্রত্যাখ্যানের দ্বান্দ্বিকতাকে প্রদর্শন করে।
- নিম্নবর্গ চেতনা একটি স্বতন্ত্র বিষয় হলেও অধীনতার অভিজ্ঞতার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ।
- নিম্নবর্গের চেতনাকে যে কেবল তার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ সত্তা দ্বারাই চিহ্নিত করা যাবে এমনটা নয়, নিজ অস্তিত্ব রক্ষা ও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের উচ্চবর্গের স্বার্থ অনুযায়ী চলতে দেখা যায়।
- নিম্নবর্গের চেতনায় ধরা পড়ে ধর্মভাব।
- নিম্নবর্গ তার নিজস্ব চেতনার অবস্থা অপরকে বোঝাতে অক্ষম। অর্থাৎ নিম্নবর্গ নিজের কথা অপরের কাছে প্রদর্শন করতে পারে না বা করতে পারলেও অপরের কাছে তা বোধগম্য হয় না।
- নিম্নবর্গীয় চেতনার উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হল সমাজ-কাঠামোয় নিজ অবস্থানকে নির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে তারা প্রাথমিকভাবে সম্মিলিত প্রতিবাদের সৃষ্টি করে এবং এর সফলতা ও বিফলতায় নির্ভর করে নিম্নবর্গীয়তার যা কিছু অপমানকর বা শ্রেণিগত উন্নতির পক্ষে বাধা সৃষ্টিকারী তা সব কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করে যাতে তারা উন্নতশ্রেণির সমাজে স্থান পায়। অর্থাৎ যে যে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য থাকলে একজনকে নিম্নবর্গের আওতায় ধরা হয়, (যেমন নিচুজাত চিহ্নিতকারী পদবী, অনুন্নত সংস্কৃতি, নিরক্ষরতা, অমার্জিত ভাষা, নিম্নমানের পেশা, প্রান্তিকতা ইত্যাদি) তা সবই ত্যাগ, মার্জনা ও অর্জন করার মধ্য দিয়ে উন্নত সমাজের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা থাকে নিম্নবর্গীয় চেতনায়।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে, নিম্নবর্গীয়তাকে প্রত্যাখ্যান করে কোনো ব্যক্তি বা বর্গ যখন উচ্চবর্গের সমকক্ষে পৌঁছতে যায় বা পৌঁছে যায় তখন কি সে আসলেই তার বা তাদের নিম্নবর্গীয়তাকে ঘোচাতে পারে? এর উত্তর দেওয়া অল্পবিস্তর জটিল হয়ে পড়ে কারণ যে বা যারা এতদিন নিম্নবর্গের মধ্যে নিজেদের অভ্যস্ত

করে রেখেছিল এবং যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাভিত্তিক পরিচয়ে জীবন অতিবাহিত করে আসছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও সে বা তারা জন্মগত পরিচয় ও অভ্যাসগত অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। ফলে উচ্চবর্গের উন্নত সমাজের মাঝে পৌঁছেও তাদের সমক্ষে বা আড়ালে জন্মগত পরিচয়ের কারণে অপমানিত হতে হয়। আবার উল্টোদিকে নিম্নবর্গের প্রতি সামাজিকভাবে একধরনের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিও প্রদর্শন করা হয় যেখানে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় তারা যতই নিম্নবর্গের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসুন না কেন তাদের শিকড় আসলে নিম্নবর্গীয়তায় প্রোথিত। নিম্নবর্গের এই অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় ভীতি, নিজেকে সর্বসমক্ষ থেকে আড়াল করে রাখার প্রবণতা ও নিরাপদ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ নিম্নবর্গকে উচ্চবর্গের কাছে 'অলীক' করে তোলে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর 'Can the subaltern speak?' প্রবন্ধে এ কথাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যা কিনা নিম্নবর্গের ক্ষেত্রে একটি তাত্ত্বিক ধারণা তৈরি করেছে। তিনি মনে করেন,

> 'subaltern consciousness as self consciousness of a sort is what inhabits…
> subaltern consciousness as emergent collective consciousness is one of the main themes of these books.' (Landry (eds.) 1996, p.215)

নিম্নবর্গের চেতনা একধরনের স্বকীয় স্বচেতনা যা আবিষ্কার করা 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকল্পের প্রধান বিষয় এবং এই বিশিষ্ট চেতনার মধ্য দিয়েই নিম্নবর্গকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

১.৬ নিম্নবর্গ : সংজ্ঞা ও স্বরূপ সন্ধান

দুই দশক ধরে চলে আসা বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমালোচনার পরও নিম্নবর্গের সর্বগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। প্রত্যেক সমালোচক নিজেদের মতো যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ইতিপূর্বের আলোচনার ওপর নির্ভর করে এই স্থানে আমরা নিম্নবর্গকে সংজ্ঞায়িত করার পাশাপাশি তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সূত্রাকারে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

রণজিৎ গুহ 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'এর প্রথম খণ্ডে তাঁর 'On some aspects of the historioghraphy of colonial India' (Guha (ed.) 1982, p.i) প্রবন্ধে দক্ষিণ এশিয়ার ঔপনিবেশিক সমাজ প্রেক্ষাপটে 'Elite' ও 'Subaltern' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। প্রবন্ধের শেষে নোট হিসাবে তিনি 'Elite' ও 'Subaltern Class' এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

> "The term 'elite' has been used in this statement to signify dominant groups, foreign as well as indigenous. The dominant foreign groups included all the non- Indian, that is, mainly British

> officials of the colonial state and foreign industrialists, marchants, financiers, planters, landlords and missionaries."   (Guha (ed.) 1982, p.8)

অর্থাৎ উচ্চবর্গ হল তারাই যারা ঔপনিবেশিক ভারতে বিদেশি, অ-ভারতীয়, প্রধানত ব্রিটিশ বিদেশি শিল্পপতি, মার্চেন্ট, পুঁজি বিনিয়োগকারী, ভূ-স্বামী এবং মিশনারি। অন্যদিকে তিনি 'People' ও 'Subaltern class' বলতে বুঝিয়েছেন,

> "The terms 'people' and Subaltern classes' have been used as synonymous through-out this note. The social groups and elements included in this category represent the demographic difference between the total India population and all those whom we have deccribed as the elite. Some of these classes and groups such as the lesser rural gnntri, improverished landlords, rich peasants and upper middle peasants also 'naturally' ranked among the 'people' and the 'subaltern' could under certain Circumstanees act for the elite…"   (Guha (ed.) 1982, p.8)

অর্থাৎ রণজিৎ গুহ 'Elite' ও 'Subaltern' শব্দ দুটি ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য তৈরি করতেই ব্যবহার করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতে উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গ হিসেবে যারা চিহ্নিত হয়েছে তাদের বাদ দিলে যে বিপুল জনসংখ্যা অবশিষ্ট থাকে তারাই হল রণজিৎ গুহের সংজ্ঞায় 'People' ও 'Subaltern class'। অন্যদিকে তিনি বলেছেন,

> "উচ্চবর্গ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই, ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভু শক্তির অধিকারী ছিল। প্রভু স্থানীয়দের দুভাগে ভাগ করা যায়-বিদেশি ও দেশি। বিদেশি প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে যারা এই সংজ্ঞাসম্মত তারাও দু-ধরনের-সরকারি ও বেসরকারি।... ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকী অংশ ; গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষি ও প্রায় গরিব মাঝারি নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য। তা ছাড়াও এই সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে গণ্য হবে নির্বিত্ত ভূস্বামী, অপেক্ষাকৃত হীনবল গ্রামভদ্র, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মাঝারি কৃষক এবং ধনী কৃষকরাও-"   (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৩৩)

সমালোচক দীপেশ চক্রবর্তী 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর সপ্তম খণ্ডে 'সাবঅলটার্ন' বলতে বুঝিয়েছেন গৃহ কর্মচারী বা ভদ্রলোকের বাড়িতে ভাড়া করা চাকর সম্প্রদায়কে। তাঁর মতে,

> "The physically harder part of domestic labour, one could reasonably assume, would have been performed by hired servents (or retainers) in many bhadralok families Subaltern groups whose histories we have not even began to imagine."   (Chatterjee (eds.) 1993, p.62)

সমালোচক জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে তাঁর বহু আলোচিত 'The prose of Otherness' প্রবন্ধে 'সাবঅলটার্ন' বলতে অনেকটা দীপেশ চক্রবর্তীর সুরেই বলেছেন,

> "… untouchables, immigrants, woman, children, domestic servants and a myriad others…backward section (unfortunately ill-educated insufficiently enlightned)…lower clasess and marginal groups."
> (Arnold (eds.) 1994, p.191-98)

অর্থাৎ তিনি অস্পৃশ্য, নারী, শিশু, গৃহ-কর্মচারী বা চাকর, অভিবাসী, অগণিত অপর, পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, অশিক্ষিত মানুষ, নিচুজাতি ও প্রান্তিক মানুষদের নিম্নবর্গের আওতায় আনতে চেয়েছেন।

সমালোচক অশোক সেন 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'এর পঞ্চম খণ্ডে 'সাবঅলটার্ন'কে চিহ্নিত করেছেন এইভাবে,

> "The term 'subaltern' is used to denote the entire people that is subordinate in term of class, cast, age, gender and office, or in any other way. The historical processes of colonial India were marked by and admixture of precapitalist and capitalist relations, the nature of power, exploitation and popular rasistance in such a society was not, therefore amenable to adequate understanding in term of distinct class categories that can be clearly enunciated. " (Guha (ed.) 1987, p.203-4)

বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ও সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক 'Subaltern' কাকে বলা হবে এ বিষয়ে রণজিৎ গুহের সঙ্গে একমত হলেও তিনি নারী সমাজকে পৃথকভাবে নিম্নবর্গের আওতাভুক্ত করতে চেয়েছেন। যদিও তিনি মনে করেন,

> "…every moment that is noticed as a case of subalternity is undermine. We are never looking at the pure subaltern. There is, then, something of a not-speakingness in the very notion of subalternity."
> (Landry (eds.) 1996, p.289)

ফলে তিনি 'Subaltern' বলতে বুঝিয়েছেন-

> "I think the word 'subaltern' is losing its defenitive power because it has become a kind of buzzword for any group that wants something that it dose not have." (Landry (eds.) 1996, p.290)

অর্থাৎ তিনি সরাসরি নিম্নবর্গ বলতে কাকে বা কাদের বোঝানো হবে সে বিষয়ে আলোচনা না করে নিম্নবর্গের ধারণাটি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করতে চেয়েছেন যাতে নিম্নবর্গ কাকে বলা হবে সে ধারণাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে উপরিউক্ত তাত্ত্বিক অভিমতগুলির পরও নিম্নবর্গের স্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা নিম্নবর্গের সম্ভাব্য একটি সংজ্ঞা নির্ধারণে অগ্রসর হতে পারি।

১.৬.১ নিম্নবর্গের সম্ভাব্য সংজ্ঞা

ঔপনিবেশিক ভারতে প্রভুত্বের অধিকারীর বিপরীতে অবস্থিত যারা ক্ষমতার সম্পর্কসূত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অধীনতার চেতনাসম্পন্ন এবং পরবর্তীকালে যারা বৃহৎ অর্থে সমাজ-কাঠামোয় উচ্চবর্গের বিপরীতে কোনো এক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েও নিজেদের অধিকার আদায়ের বোধে সম্মিলিত প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ গড়ে তোলে তারাই নিম্নবর্গ। তা ছাড়া সাময়িক

শ্রেণিচেতনা সম্পন্ন এক বৃহৎ অংশ জুড়ে থাকা অপর, ব্রাত্য, প্রান্তিক, অন্ত্যজ জনগণ যারা নিজেদের স্বার্থ বা প্রয়োজনের কথা অশিক্ষা বা হীনমন্যতার কারণে উচ্চবর্গের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয় এবং উচ্চবর্গের কাছে যারা প্রায়শই অলীক হিসেবে বিবেচিত তাদেরই নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।

যদিও এক্ষেত্রে আমরা আলাদা করে নিম্নবর্গীয় চেতনাকে গুরুত্ব দিতে চাই। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ করেছি নিম্নবর্গকে ক্ষমতার সূচকে নির্ধারণ করা হলেও নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গের এক ধরনের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি কাজ করে, যা একজন নিম্নবর্গের নিম্নবর্গীয়তাকে প্রমাণ করে। আসলে একজন নিম্নবর্গ যখন উচ্চবর্গের সমকক্ষে পৌঁছতে চায় তখন সেই যাত্রাপথে তাকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। সেই সংগ্রাম উচ্চবর্গকে করতে হয় না। এক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হবে, একজন নিম্নবর্গ উচ্চবর্গের সমকক্ষে পৌঁছে গেলেও সমাজে তার নিম্নবর্গীয়তা মুছে যায় না। নিম্নবর্গীয় চেতনা তার মধ্যে বরাবর ক্রিয়াশীল থাকায় সে উচ্চবর্গের সমাজ সংস্কৃতি থেকে ধীরে ধীরে সরে আসে এবং সমাজে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এই ধারণাকে মনে রেখে আমরা নিম্নবর্গের বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে দৃষ্টি দিতে পারি।

১.৬.২ নিম্নবর্গের স্বরূপ

সামগ্রিক আলোচনায় নিম্নবর্গের যে বৈশিষ্টের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে তা আমরা আলোচ্য পরিচ্ছেদে সূত্রাকারে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

- গ্রামশি তাঁর ‘প্রিজন নোটবুক’-এ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ‘সাবঅলটার্ন’ বলতে শ্রমিক শ্রেণিকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণি শোষিত ও শাসিত হয়। শুধু তাই নয়, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বেও সমাজের এক মেরুতে প্রভুত্বের অধিকারী ডমিন্যান্ট শ্রেণি এবং অপর মেরুতে যারা অধীন সেই ‘সাবঅলটার্ন’ শ্রেণি অবস্থান করে।
- নিম্নবর্গ তাদের নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সামাজিক সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদানকে বেছে নেয় বলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের সঙ্গে তাদের একটি বিভেদ তৈরি হয়। ফলে জন্ম নেয় বিরোধ। এই বিরোধ থেকে তৈরি হয় নিম্নবর্গের এক ধরনের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ।
- উচ্চবর্গের চেতনার বিপরীতে নিম্নবর্গের চেতনাও কোনো না কোনোভাবে তার স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়।
- নিম্নবর্গের চেতনা স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন। কারণ অধীনতার অভিজ্ঞতা নিম্নবর্গের মূল বৈশিষ্ট্য।

- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গকে দেখা যায় নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত একটি জীব হিসেবে। অন্যে চালিত করলে তবেই যেন সে চলে। একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়ই শাসকগোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রাহ্য করে।
- গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মনে করেন, নিম্নবর্গ ধারণাটি গড়ে উঠেছে কোনো এক আদর্শ থেকে বিচ্যুতির প্রসঙ্গে।
- বিশিষ্ট সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক-এর মতে, নিম্নবর্গ তার নিজের কথা কখনোই বলতে পারে না। কারণ তারা যা বলতে চায়, তা কর্তৃপক্ষ শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে না বা শুনতে চায় না ফলে বক্তা যখন শ্রোতাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয় তখন নিম্নবর্গের কথা বলার সুযোগ ও স্থান থাকে না।
- নিম্নবর্গ তাদের নিম্নবর্গীয়তা ঘোচানোর জন্য উচ্চবর্গকে তিরস্কার করলেও পরবর্তীকালে উন্নত ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে উচ্চবর্গের সমকক্ষে পৌঁছতে চায়।
- উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধার্মিক ও আদর্শগত দিক থেকে অমার্জিত অবস্থানে বিরাজ করে।
- নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনা ও বিদ্রোহ সংগঠনের চেতনায় একধরনের ধর্মভাব প্রাধান্য পায়। ফলে নিম্নবর্গ দ্বারা সংগঠিত বিদ্রোহ বা গণআন্দোলনগুলি কর্মসূচি, পরিকাঠামো ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ব্যর্থ হয়ে যায়।
- নিম্নবর্গ যেহেতু উচ্চবর্গের অধীনতা ও ক্ষমতার মাপকাঠিতে বিচার্য সেহেতু নিজেদের অধীনতাবোধ নিম্নবর্গের মধ্যে একদিকে যেমন শ্রেণিচেতনার জন্ম দেয় তেমনই অন্যদিকে বর্গীয়প্রীতি ও সৌহার্দবোধ তৈরি করে।
- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্রতা থাকলেও এদের ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্পষ্ট নয়। জটিল ও বাস্তব সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে এরা অনেক সময়ই উচ্চবর্গের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করে।

১.৭ সারাংশ

রণজিৎ গুহ বা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের মতো তাত্ত্বিক-সমালোচকদের মতে সমাজ কাঠামোর তলদেশ থেকে ইতিহাস তুলে আনতে হলে সেই স্তরের বাস্তবতাকে চিনতে ও বুঝতে হবে। ফলে নিম্নবর্গকে তার সমাজ, ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে বিচার করার অবকাশ থেকে যায়। তাই এমন একজন ঐতিহাসিকের প্রয়োজন যিনি সেই তলদেশেরই একজন বাস্তব অভিজ্ঞতা

সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে নিরপেক্ষভাবে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু বাস্তবে এমন ঐতিহাসিকের সন্ধান পাওয়া যায় না কারণ সেই রচনাকার প্রাথমিক দিকে নিরপেক্ষ থাকলেও পরবর্তীকালে নানা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কোনো এক বিশেষ বর্গের পক্ষপাত করতে বাধ্য হন। ফলে নিরপেক্ষ সাক্ষী ও তথ্য সেভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। তবে যদি আমরা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখা যাবে এমন কিছু সাহিত্যিক রয়েছেন যারা সমাজের সেই তলদেশে অবস্থান করে নিজেদের অভিজ্ঞতা সাহিত্যের আকল্পে সংরক্ষণ করেছেন এবং করছেন। হ্যাঁ, সেখানে কল্পনার আধিক্য রয়েছে কিন্তু সেটুকু অংশ বাদ দিলে একজন সাহিত্যিকের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না সহজে। ফলে সাহিত্যের আকল্পেও নিম্নবর্গীয় চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্যরূপে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেই সংকল্পেই অগ্রসর হব।